প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯
মুদ্রক : প্যারট প্রেস, ১২ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার, কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

আমার ঈশ্বরী-কে

অনুবাদকের অন্যান্য বই

ফরাসি বিপ্লব

হিটলারের যুদ্ধ : প্রথম দশ মাস

: ব্লিৎস্‌ক্রীগ রণনীতি ও রণকৌশল

য়োরোপের ইতিহাস

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস

The Marginal Men.

প্রস্পের মেরিমে

কারমেন

মুখবন্ধ

প্রস্পের মেরিমে ফরাসি সাহিত্যের মহোত্তম গল্প লেখকদের অন্যতম। তাঁর অধিকাংশ গল্পই nouvelle (আমরা যাকে বড় গল্প বলি)। তিনি শুধু গল্পই লেখেননি ; তিনি প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদও ছিলেন। ১৮০৩-এর ২৮ সেপ্টেম্বর পারিতে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম হয়। বাবা-মা দুজনেরই ছিল পরিশীলিত বিদগ্ধ মন। দুজনেই শিল্পী ছিলেন। প্রথম লিসে অ্যাঁপেরিয়াল (Lycee Imperiale) এবং পরে পারিতে আইনের ছাত্র ছিলেন মেরিমে। যখন তিনি নিজেকে গড়ে তুলছিলেন, তখন তিনি বিশেষভাবে পড়তেন আঠারো শতকের সাহিত্য : বিশেষভাবে রুশো এবং ভলতের। তিনি ইংরেজি ও স্প্যানিশ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। গ্রিক শিখেছিলেন এবং অতিপ্রাকৃতের সঙ্গেও তাঁর কিছু পরিচয় ছিল। অনেক ইংরেজ ও ফরাসি শিল্পী তাঁদের বাড়িতে আসতেন। হয়তো এ থেকেই ইংরেজি রুচি ও স্থৈর্য সম্পর্কে তাঁর আজীবন মুগ্ধতা ছিল। যে সমাজে তিনি মেলামেশা করতেন, সেই সমাজের প্রবণতা ছিল রহস্য, শ্লেষ ও আধিক্যের দিকে। সেই যুগের দুটি বৌদ্ধিক প্রবণতার মধ্যে তিনি ভেসে বেড়াচ্ছিলেন : একটি চেয়েছিল শিল্পকে আঠারো শতকে চোখ ফিরিয়ে তাকে নব্য ধ্রুপদী, নৈর্ব্যক্তিক ও নিরুত্তাপ রূপ দিতে ; অন্যটি শিল্পের নবজাগরণের জন্য নতুন শতাব্দীর আবাহন করতে চেয়েছিল। তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু স্তাঁধাল মেরিমেকে তাঁর নিজস্ব পথ খুঁজে বার করতে বলেছিলেন এবং সেই পথ খুঁজে বার করতে সাহায্যও করেছিলেন। তিনি মেরিমেকে তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র সাহিত্যের দিকে পরিচালিত করেছিলেন।

১৮২২-এ মেরিমে ক্রমওয়েল নামে একটি নাটক লেখেন। এই নাটকটি প্রকাশিত হয়নি এবং তার পাণ্ডুলিপিও হারিয়ে যায়। ১৮২৫-এ তাঁর তেয়াত্র দ্য ক্লারা গাজুল (Theatre de clara Gazul) প্রকাশিত হয়। এই বইটি স্প্যানিশ কাব্যনাট্য থেকে আহৃত নাটকের সংগ্রহ। জোসেফ লেত্রাঁজ এই ছদ্মনামে এই নাট্যসংগ্রহটি তিনিই লিখেছিলেন। এই ছদ্মনাম ব্যবহার করা থেকে রহস্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতার

পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এই নাটকগুলি ক্লারা গাজুল নামে স্প্যানিশ অভিনেত্রীর লেখা এই নাটকগুলি জোসেফ লেত্রাঁজের অনুবাদ। অভিনেত্রীর একটি জীবনীও তিনি বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। পরের বছর মেরিমে যে বইটি লেখেন, সেই বইটির লেখক সম্পর্কেও তিনি পাঠককে ভুল পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। বইটি ছিল কিছু গাথার সংগ্রহ। সার্বভাষা থেকে অনূদিত গাথার সংগ্রহ হিসেবে তিনি বইটিকে চালাতে চেয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন লা গুজলা। অনেক ফরাসি ও বিদেশী পণ্ডিত, এমনকি সার জন বাউরিঙ-এর (Sir John Bowring) মতো স্লাভ ভাষায় পণ্ডিতও মেরিমের এই ছলনাকে ধরতে পারেননি। পুশ্‌কিনও এই ভুল করেছিলেন। সার ওয়াল্‌টার স্কটের প্রভাবে এসময়ে ফ্রান্সে ঐতিহাসিক্ নাটক ও উপন্যাসের নবজন্ম ঘটেছিল। যুগের রুচি অনুসরণ করে মেরিমেও এই সময়ে একটি সংক্ষিপ্ত নাটক (La Jacquerie) ও একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লা ক্রনিক দ্যু রেনে দ্য শার্ল নেভিয়েম (La Chroneque du regne de charles ixm) রচনা করেছিলেন।

এই সব বই লেখা সত্ত্বেও এই তরুণ লেখক তখনো তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলতে শুরু করেননি। তিনি পথ খুঁজছিলেন। ১৮২৯-এ রেভ্যু দ্য পারিতে (Revue de Paris) মাতেও ফালকোন (Mateo Falcone) লিখে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজস্ব পথে চলতে শুরু করলেন। এই বছর তিনি দুটি মিলনান্তক নাটক লোকাজিয়ঁ (L'occasion) ও ল্য কারস দ্য স্যাঁ সাক্রমঁ (Le carosse de Saint Sacrement) রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই বছরই কিছু পত্র-পত্রিকায় তিনি পরপর কয়েকটি গল্প লেখেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ল্যাঁলভমঁ দ্য লা র‍্যদুত (L'enlevement de la redoute) ও তামাংগো (Tamango)। ১৮৩৩-এ তিনি এই দুটি গল্প, ল্য ভাজ এত্রুস্ক (Le Vase Etrusque) ও আরো কয়েকটি গল্প নিয়ে মোজেইক (Mosaique) নামে একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর আরো গল্প প্রকাশিত হয় : লা দুব্‌ল মেপ্রিজ (La Double Meprise), ১৮৩৩, লেজাম দ্যু পুরগাতোয়ার (Les Ames du Purgatoire) ১৮৩৪, লা ভেনুস্ দিল (La Venus d'Ille) ১৮৩৭, কলঁবা (Colomba) ১৮৪০, আরস্যান গিয় (Arsine Guillot) ১৮৪৪, কারমেন (Carmen) ১৮৪৫ এবং লাবে ওব্যাঁ (L'abbe' Aubein) ১৮৪৬। জীবনের শেষ পর্বে আবার তিনি সৃজনশীল রচনায় ফিরে আসেন। এ সময়ে তিনি লকি (Lokis) ১৮৬৯, লা শাঁবর ব্লো (La Chambre Bleue) ১৮৭১, দিউমান (Djoumane) ১৮৭৩, রচনা করেন।

লুই ফিলিপের শাসনকালে তিনি জনপালন দপ্তরে যোগ দেন এবং নৌবাহিনীর মন্ত্রকের একটি বিভাগের প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩১-এ জেনি দাক্যাঁ নামে

একটি তরুণীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। জেনি তাঁর অনুরক্ত বন্ধুতে পরিণত হন। চল্লিশ বছর ধরে তাদের মধ্যে পত্রবিনিময় হয়। জেনির কাছে মেরিমের লেখা চিঠি ১৮৭৩-এ লত্র আ য়ুন অ্যাঁকনু (Letteres a une inconnue) নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৪-এ তিনি ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের ইনস্পেকটর জেনারেল নিযুক্ত হন। পঁচিশ বছরের বেশি সময় তিনি ক্লান্তিহীন উৎসাহে এই কাজ করেন। ইতিহাস অধ্যানেও ছিল তাঁর সীমাহীন অধ্যবসায়। তারই ফলশ্রুতি এসে স্যুর লা গ্যার সোসিয়াল (Essai sur la guirre sociale) ১৮৩৪, এতুদ স্যুর লিস্তোয়ার রোমেইন (Etude sur l'histoire Romaine) দুই খণ্ড—১৮৪৪, ইস্তোয়ার দ্য দন পেদ্র প্র্যামিয়ার (Histoire de Don Pedreler roi de Castille) ১৮৪৪। ১৮৩৩-এ তিনি আকাদেমি দে জ্যাঁস ক্রিপসিয়ঁ এ বেল লভ্র (Academic des Inscriptions et Belles Lettres) -এর সদস্য এবং ১৮৪৪-এ তিনি আকাদেমি ফ্রাঁসেজের (Academie Francaise) সদস্য নির্বাচিত হন।

১৮৩০-এ যখন তিনি স্পেনে ছিলেন, তখন মন্তিজোর কাউন্টেসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৮৫৩-র ২৩ জানুয়ারি তাঁর মেয়ে ইউজেনি ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী হন। তাঁর অনুরোধে মেরিমে সেনেটের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার জন্য তিনি রাজকীয় মুদ্ধবৃত্তের অন্তর্গত হন। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে সম্রাট নেপোলিয়নের যে জীবনী তৃতীয় নেপোলিয়ন লিখেছিলেন তা উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। পক্ষান্তরে সম্রাজ্ঞীর প্রতি পিতৃসুলভ স্নেহের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল তাঁর চরিত্র ও সৌন্দর্যের প্রতি সশ্রদ্ধ মুগ্ধতা। দরবারের সদস্য হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সৃজনশীল কর্মের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়নি। এসময়ে তিনি ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। জীবনের শেষ পর্বে তিনি ক্রমাগত ভ্রমণ করতেন। প্রায়ই লন্ডন যেতেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ সার অ্যান্টনি পানিজ্জির সঙ্গে দেখা করতে। তিনিই মিরেমের বৃদ্ধবয়সের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পানিজ্জিকে লেখা তাঁর বহু দীর্ঘ চিঠিকে মেরিমের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে (Letters a M. Panizzi : 1850 - 1871)। ১৮৫৭-র পর শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে প্রত্যেকটি শীত কাটাতে হতো কান-এ (Cannis)। তাঁর সময় কাটত বন্ধু-বান্ধব ও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ইংরেজদের সাহচর্যে। তাঁর মায়ের দুজন বান্ধবী মিস ফ্যানি ল্যাগডেন ও মিসেস ইউয়ার্স তাঁকে স্নেহ করতেন। ফরাসি-জার্মান যুদ্ধ তাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হবে তা তিনি জানতেন। ফ্রান্সে যখন প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল ও সম্রাজ্ঞী ইউজেনি ইংলন্ডে আশ্রয় নিলেন। তখন তিনি পারিসেই ছিলেন। প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে তিনি কান-এ ফিরে

যান। ১৮৭০-এর সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

রচনাশৈলী ও ব্যক্তিত্ব—সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে মেরিমে বিচরণ করেছেন। তিনি নাটক লিখেছেন, ছোট গল্প লিখেছেন। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনামূলক অনেক বই লিখেছেন। তিনি রোমান ও স্পেনের ইতিহাস সম্পর্কে যে বই লিখেছেন তা এখনও মূল্যহীন হয়ে যায়নি। সুগভীর পাণ্ডিত্য ও বিশিষ্ট রচনাশৈলীর জন্য এই সব বই এখনও ব্যবহৃত হয়। তাঁর ইসতোয়ার দ্য দন পেদ্র প্র্যমিয়ার, রোয়া দ্য কাসতিলকে, এখনও একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে মেরিমের কাজও ভুলে যাওয়ার মতো নয়। অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই তিনি এই কাজটি গ্রহণ করেছিলেন। যে সময় রাস্তাঘাট প্রায় দুরতিক্রম্য ছিল, সেই সময় তিনি সারা ফ্রান্স ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ প্রসূত অসংখ্য পুরাতত্ত্ববিষয়ক মন্তব্য নোট্স দ্য ভোয়াইয়াজ শীর্ষক গ্রন্থে (Notes de Voyage) (পাঁচ খণ্ড, ১৮৩৫-৪০) প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৯-এর মধ্যে তিনি পোয়াতুর চার্চের ফ্রেস্কো সম্পর্কে লেগ্লিজ দ্য সেঁ সাভাঁ এ সে পেইঁতুর মুরাল (L' eglise de st. savin et ses peintures murales) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ফ্রান্সে খুব কম ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধই আছে যাকে, তিনি ধ্বংসের হাত থেকে অথবা নির্বিচার পুনরুদ্ধার থেকে রক্ষা করেননি।

রাশিয়ার ইতিহাস ও সাহিত্যের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন তিনি। তিনি রুশভাষা শেখেন ১৮৪৮-এ। ১৮৪৯-এ তিনি পুশ্‌কিনের বিভিন্ন রচনা অনুবাদ করতে শুরু করেন। পুশ্‌কিনের গল্পবলার সংক্ষিপ্ত কৌশলের সঙ্গে তাঁর রচনার সাদৃশ্য ছিল বলে তিনি মনে করতেন। তিনি গোগলের রিভাইজর (Revizor the government Inspector) ১৮৩৬ ; অনুবাদ করেন। রুশ সাহিত্য ফ্রান্সে অজ্ঞাত না হলেও এই সাহিত্য সম্পর্কে ফরাসিদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান ব্যাখ্যাকার ছিলেন মেরিমে। গোগলের তারাস বুলবা পড়ে কোজাকদের জীবন সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন। তারাস বুলবাই তাঁকে ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৩-র মধ্যে কোজাকদের নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখতে অনুপ্রাণিত করে। ১৮৬৫-তে এই প্রবন্ধ সংগ্রহ কোজাক দোত্তরফোয়া (Cosaques d'autrefois) নামে প্রকাশিত হয়।

মেরিমের অসামান্য কীর্তি তাঁর গল্প (Nouvelle) । সাহিত্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি পৃথিবীর মহত্তম লেখকদের অন্যতম। অন্যান্য রোমান্টিক লেখকদের মতো স্থানীয় বর্ণ, গন্ধ, চিত্রকে তিনি তাঁর গল্পে প্রাধান্য দেননি। তাঁর গল্পে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রধান্য। প্রেম ও তার মারাত্মক পরিণামের চিত্রণ করেছেন তিনি। এই প্রেম নিষ্ঠুর নিয়তির মতো। আবেগদীপ্ত প্রচণ্ড চরিত্র সম্পর্কে তাঁর

বিস্ময়মিশ্রিত মুগ্ধতা ছিল। এই সব চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু তাঁর চোখে পড়েছিল যা অমানবিক, যা প্রেমিক-প্রেমিকাকে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। "মাতেও ফালকোন" গল্পটির প্রধান চরিত্র এমন একজন পিতা যিনি তাঁর পুত্রকে হত্যা করেন কারণ সে পারিবারিক সম্মানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কলঁবাতে তিনি একটা যুবতী নারীর চিত্রণ করেন। সে তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর ভাইকে দিয়ে একটি মানুষকে হত্যা করিয়েছিল। কারমেনও প্রেম ও হত্যার কাহিনী। কিন্তু কারমেনের আলোচনা পরে করছি। মেরিমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : তিনি ব্যতিক্রমী মানুষকে ধরতে চেয়েছিলেন ; তিনি বাস্তবের অনুপুঙ্খ ও যথাযথ বর্ণনার দ্বারা উদ্ভট ও অতিপ্রাকৃতের উপস্থিতির প্রত্যয় এনে দিতে পারতেন। লেজাম দ্যু পুরগাতোয়ার (Les Ames du purgatoire) ও ভেনু দিল (Venus d'Ille)-তে তার পরিচয় মেলে। গল্পের বিষয় যাইহোক না কেন, তার চিত্রণে তাঁর অসামান্য শক্তির পরিচয় মেলে। কয়েকটি লাইনে তিনি তাঁর চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন। তাঁর রচনাশৈলীতে ভলতেরের ধ্রুপদী সরলতা চোখে পড়ে। তিনি অর্থবহ ঘটনাকে বেছে নিতে পারতেন এবং তা পাঠকের কাছে উপস্থিত করার জন্য যথাযথ শব্দের ভাণ্ডারও তাঁর ছিল।

মেরিমের করেসপঁদাস জেনেরাল (Conespondance generale) থেকে বোঝা যায় যে পত্রলেখক হিসেবে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধ থাকায় তাঁর চিঠিতে সেযুগের ঘটনার ও আচার-আচরণের জীবন্ত প্রতিকৃতি চোখে পড়ে। তাঁর চরিত্রে গভীরতম দিকও এতে উন্মোচিত হয়েছে। অনেকেরই ধারণা তিনি সন্দেহবাদী ও অনুভূতহীন। কিন্তু চিঠিতে তাঁর যে চরিত্র ধরা পড়ে তা অনুরক্ত বন্ধুর ; বিদ্রূপপ্রবণ, সন্দেহবাদী অনাসক্ত মানুষের মুখোশেব অন্তরালে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল, সহৃদয় এবং কখনো কখনো অতশয় নরম মানুষের। সামগ্রিকভাবে তাঁর পত্রাবলী ও সৃষ্টিকর্মের বিচার করলে দেখা যাবে যে সেযুগের লেখকদের মধ্যে মেরিমেই একমাত্র লেখক যার রচনায় সময়ের পদচিহ্ন বিশেষ নেই। তাঁর কারণ গল্প রচনায় তাঁর পরিমিতিবোধ ও সংযম। তিনি লিখেছেন রোমান্টিক যুগে। কিন্তু তাঁর রচনায় ধ্রুপদী সাহিত্যের কিছু চিহ্ন চোখে পড়ে।

মেরিমের সাহিত্যজীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বের রূপরেখা এই রকম : অভিজাত রুচিসম্পন্ন যুবক মেরিমে আন্দালুশিয়ার খচ্চরচালকদের আদিম বর্বরতায় মুগ্ধ। এই ফুলবাবুর মুক্তপন্থী রাজনীতির প্রতি আস্থাও সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর বন্ধু স্তাঁধাল ও ফুবিয়ের মতোই তাঁর মতামতও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। অথচ এই মুক্তপন্থী লেখক রোমান্টিক। কিন্তু তাঁর রোমান্টিকতা গীতিকাব্যধর্মী কবিত্বময় রোমান্টিক নয়। তাঁর রোমান্টিকতা বাস্তব। যুক্তিসহ ও গদ্যময়। প্রথম পর্বে তেয়াত্র

দ্য ক্লারা গাজুল লিখে বাইশ বছর বয়সে তিনি সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন এবং ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি তাঁর অধিকাংশ কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেন। যথা, মতেও ফালকোন (Mateo Falcone), ল্যাঁলভমঁ দ্য লা র‍্যাদুত (L'enlevement de la redoute, ল্য ভাজ এত্রুস্ক (Le vase Etrusque) ও তামংগো (Tamango)।

দ্বিতীয় পর্ব—১৮৩৪-এ ৩৪ বছর বয়সী মেরিমেকে তাঁর বন্ধু আদলফ্ তিয়ের ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের ইন্সপেক্টর জেনারেল নিয়োগ করেন ভ্রাম্যমাণ ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে তিনি যখন অত্যন্ত সক্রিয় তখন তিনি ভেনু দিল, কলঁবা, আরস্যান দিগও ও কারমেন রচনা করেন।

তৃতীয় পর্ব— এসময়ে তিনি সাম্রাজ্যের সেনেটের সদস্য এবং সম্রাজ্ঞীর প্রশ্রয়ভাজন ঘনিষ্ঠ মানুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বোনাপার্তবাদী হয়ে যাননি।

রোমান্টিক প্রজন্মে মুছেকে (Musset) বাদ দিলে মেরিমের প্রতিভার বালপ্রৌঢ়তা আর কারু ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর প্রথম ওভগুলিতে ভিকতর উগো স্বয়ং কিছু ধ্রুপদী অলংকার ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে একই যুগে মেরিমে তাঁর এস্‌পাইনল ও দানমার্ক (Ispagnolau Danemark) লেখেন। ইতিমধ্যে তিনি ভাষার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর লেখনী যা সৃষ্টি করছিল, তার মধ্যে তাঁর নিরাবেগ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। এখানে উগোর সঙ্গে তার বৈপরীত্য চোখে পড়ে। এবিষয়ে তেলের মন্তব্য যথাযথ: অকপট উন্মোচনের, প্রবল উৎসাহ ও উল্লাসের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কখনো নিজেকে পুরোপুরি খুলে না ধরা, নিজের একটি অংশকে সর্বদা আলাদা করে রাখা, নিজের অথবা অপরের প্রতারণার শিকার না হওয়া, লেখার সময় মনে রাখা যে একজন উদাসীন দর্শক বিদ্রূপভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে এবং এও মনে রাখা যে এই দর্শক তিনি নিজেই। তাহলে কি একথা বলা চলে যে তিনি রোমান্টিক ছিলেন না? তাও বলা চলে না। তবে তাঁর রোমান্টিকতায় আত্মকথনের প্রবল উচ্চারণ, বাক্যচ্ছটার বিস্তার ছিল না। আঠারো শতকের ভাবাদর্শ ও বিশ্বকোষগোষ্ঠীর দ্বারা অনুপ্রাণিত যে মুক্তপন্থী গোষ্ঠী ১৮২৫ নাগাদ রুশো ও শাতোব্রিয়াঁর অনুভূতিময়তার পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন।

১৮৭১-এ তাঁর বাড়িতে আগুন লাগায় মেরিমের কাগজপত্র সব পুড়ে যায়। তাতে তাঁর জীবনী রচনা অতিশয় জটিল অথবা সরল হয়ে গেছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বালজাক, সেঁত-বয়ভ, ফ্লাবেয়ার আমাদের কাছে মেরিমের চেয়ে অনেক স্পষ্টভাবে উপস্থিত হন। তার কারণ সমকালীন মানুষের সাক্ষ্য। কিন্তু মেরিমের ক্ষেত্রে সমকালীন মানুষের সাক্ষ্য নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি সেনেটের সদস্য

ছিলেন। অর্থাৎ সমতার কেন্দ্রে ছিলেন। তাই তাঁর সম্পর্কে সমকালীন মানুষের ঈর্ষা, এমনকি শত্রুতাও ছিল। তিয়ের প্রাসাদের প্রভুর অন্তরঙ্গ মানুষকে ক্ষমা করা কঠিন। তাঁরা খুশিমতো তাঁকে লক্ষ করে কাদা ছুড়তেন। তাঁরা তাঁর মতামতের অন্তরিকতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। আরো একটি কথা: মেরিমে নিজেই তাঁর ভাবপ্রতিমাকে অনেকটা ক্ষুণ্ন করেছেন। ব্যসনে বিরক্ত (blasc) ও সন্দেহবাদী মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর খ্যাতি অথবা অখ্যাতিকে সযত্নে লালন করেছেন। তাঁর গল্পের সেঁ ক্লেয়ারের মতো তিনিও জন্মেছিলেন 'একটি ভালবাসায় ভরা কোমল হৃদয় নিয়ে।' কিন্তু চাতুর্যের সঙ্গে তিনি তা গোপন রেখেছিলেন যেন তা বিশ্রী দুর্বলতা। সিরকুর লিখেছেন, "মেরিমে একটি অত্যন্ত মৌলিক ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর কৃত্রিম আচার-আচরণের আড়ালে সযত্নে তাঁর চরিত্রের গুণরাশিকে লুকিয়ে রাখতেন। তিনি তাঁর পরিমিত জীবনযাত্রার সঙ্গে উচ্চপদকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেজন্য কখনো বিব্রত বোধ করেননি। উচ্চপদের দম্ভও তাঁর ছিল না। তুর্গেনিভের সঙ্গে মেরিমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একটি প্রবন্ধে তুর্গেনিভ মেরিমে সম্পর্কে লিখেছিলেন: "বাইরের ঔদাসীন্য ও শীতলতার অন্তরালে তিনি একটি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হৃদয়কে লুকিয়ে রাখতেন।" এমিল ওজিয়ে মেরিমে সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি "মেকি অহংবাদী"। তুর্গেনিভও লিখেছেন যে মেরিমের মতো এমন নৈর্ব্যক্তিক মানুষ, "আমি" এই শব্দটির এত বড় শত্রু তিনি কখনো দেখেননি। এমন অহংকারশূন্য মানুষও তাঁর চোখে পড়েনি। এমন তাঁর চরিত্রের উপহাসপ্রিয়তা ও বিচক্ষণতা বেড়ে যেতে থাকে এবং তাঁর বিশিষ্ট জীবনদর্শনে গভীর মানবিকতাবোধও প্রকাশিত হতে থাকে। পরিশেষে মেরিমে সম্পর্কে একজন কবির অভিমত তুলে দেওয়া যেতে পারে। এই কবির প্রতি মেরিমে সদয় ছিলেন না। এই কবি বোদলেয়র। তিনি লিখছেন, "আপাত শীতলতা, আপাত কৃত্রিমতা, তুষারের আঙরাখা ঢেকে রেখেছিল তাঁর বিশুদ্ধ সংবেদনশীলতাকে, প্রেয় ও সুন্দরের জন্য তার তীব্র ব্যাকুলতাকে।"

যে মুখোশের আড়ালে মেরিমে নিজেকে লুকিয়েছিলেন, তাঁর অসংখ্য ও বিচিত্র চিঠিপত্র তা খুলে ফেলতে সাহায্য করে। চিঠিপত্রের মধ্যে আমরা প্রথমদিকে যে মেরিমেকে পাই, তিনি প্রাণচঞ্চল, উদ্ধত, বিদ্রূপে ভরা ও জীবনীশক্তিতে পূর্ণ। পঞ্চাশে পৌঁছে যাওয়ার পর তাঁর বার্ধক্য আসে অতি দ্রুত, শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে গম্ভীর ও বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁর শেষ দিকে কিছু চিঠি ভস্মের অদ্ভুত স্বাদ এনে দেয়। Ecclesiastes- এর কথা মনে আনে। নারীর দেহপুষ্পে বিচরণশীল সেই পুরনো ফুলবাবু যিনি ভেবেছিলেন যে বিদ্রূপের অন্তরালে তিনি নিজেকে লুকোতে পারবেন, ক্রমশ সব মানবিক বিষয়বস্তুর প্রতিকারহীন অসারতার ভাবনা তাঁকে অধিকার করে।

মেরিমের চিঠিপত্র তাঁর চরিত্রের যে চমকপ্রদ উন্মোচন করেছে, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সমকালীন মানুষের কাছে তাঁর যে অখ্যাতি জুটেছিল, তাঁর মুলে মেরিমের বিদ্রূপ। কিন্তু তাঁর চিঠিপত্র তাঁর ভেতরের দ্বার খুলে দেওয়ায় তিনি তাঁর কমনীয় সূক্ষ্ম রুচিকে ঢেকে রাখতে পারেননি। তাঁর সংবেদনশীলতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল : যে নারীকে তিনি ভালবাসতেন, যে তাঁর জীবনে নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিল, সে নিজেকে তাঁর জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর গল্প লেখার কলম দীর্ঘকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই নারী মাদাম ভালঁতিস দ্যল্যসের। স্তাঁধালের কাছে মেরিমে যে চিঠি লেখেন, তাতে তিনি মাদাম দ্যল্যসেরকে সাইপা নামে উল্লেখ করেছেন। ১৮৩৬-এর ১২ জানুয়ারি তিনি র‍্যাকিথাঁকে লিখছেন যে তিনি "amoureax fou de la perle des femmes"।* ১৮৩৬-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি মাদাম দ্যল্যসের মেরিমের প্রেমিকায় পরিণত হন। মেরিমে দ্যল্যসের অ্যাফেয়ার চলেছিল ১৮৬০ পর্যন্ত। তারপর মাদাম মাকসিম দু কাঁকে বেছে নেন। যখন তিনি মাদামকে পাগলের মতো ভালবাসছিলেন, তখনই তিনি তাঁর সবচেয়ে সার্থক ও নিখুঁত গল্প লিখেছিলেন : ভেনু দিল যাকে তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প বলে মনে করতেন, কলঁবা, কারমেন, আরস্যান গিও। গল্প লেখার সময় তিনি মাদামের সঙ্গে আলোচনা করতেন, তাঁর মতামত চাইতেন। তিনি তাঁর আলোকিত বুদ্ধিকে সমীহ করতেন, তাঁর মতো গ্রহণ করতেন। তিনি প্রকৃতই তাঁর প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। অতএব তিনি সরে যাওয়ার পর তাঁর কলম থেমে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

১৮৬৬-তে মাদাম আবার মেরিমের কাছে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর বন্ধুত্ব দিয়েছিলেন মেরিমেকে। মেরিমে লিখছেন, "আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে তোমার বন্ধুত্ব ফিরিয়ে দিয়েছ, যা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান..... আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার বুক থেকে একটা কাঁটা তুলে নিয়েছ।"

মাদাম দ্যল্যসের-এর সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে তাঁর গল্প লেখা বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর ভেতরের আলো আবার জ্বলে ওঠে এবং তাঁর জীবনের সঙ্গতি ফিরে আসে। এবার তাঁর যে যাত্রা শুরু হয় তাতে তিনি সুন্দরী মাদাম দ্য লাগ্রেনের সহায়তা পেয়েছিলেন। এই নারীর বন্ধুত্ব তাঁকে রুশভাষার জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করার সাহস দিয়েছিল, যার ফলে গোগোল পুশ্‌কিন ও তুর্গেনিভকে তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আমরা এখন জানি যে এই 'মেকি অসূয়ক' আসলে অত্যন্ত নরম ছিলেন। কিন্তু বাইরে তাঁর প্রকাশ ছিল না। তিনি কখনো নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরেননি। আপাতদৃষ্টিতে পল্লবগ্রাহী (Dilettante) এই

* মুক্তার মতো এই নারীর ভালবাসায় আমি পাগল

মানুষটি কিন্তু নিরন্তর কঠিন কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। আমরা এও জানি এই ব্লাজে লেখক বন্ধুবান্ধবের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করতেন। ঐহিক সব সম্মানে ভূষিত হয়েও তিনি সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন।

মেরিমে ও স্পেন—ছবির মতো দেশ স্পেন, কুইকজোটীয় শিভালরির দেশ স্পেন। স্বভাবতই স্পেনের কবি, শিল্পী ও ঐতিহাসিকেরা রোমান্টিক আন্দোলনের দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলেন। স্পেনীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য, নেপোলিয়নের স্পেন অভিযান এবং স্পেনীয়দের বীরত্বপূর্ণ গ্যারিলা যুদ্ধ—এই সব কিছু স্পেনের দিকে ফরাসিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮১৪ থেকে ১৮২৩-এর মধ্যে স্পেনীয় সাহিত্যের ফরাসি অনুবাদ হতে থাকে।

সাহিত্যিক জীবনের শুরু থেকেই মেরিমে স্পেন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি স্প্যানিশ ভাষা শিখে কালডেরন অনুবাদ করেন এবং ১৮২৪-এ স্পেনের নাটক সম্পর্কে গ্লোব-এ (Globe) চারটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮২৫-এ তাঁর তেযাত্র দ্য ক্লারা গাজুল প্রকাশিত হয়।

১৮৩০-এর জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি স্পেনের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান। তার চিঠিপত্র থেকে এবং রেভ্যু দ্য পারির (Revue de paris) ডিরেকটরের কাছ থেকে আমরা স্পেন সম্পর্কে তাঁর ধারণা জানতে পারি। ১৮৩১-এর জানুয়ারিতে লে কুর দ্য তোরো (Les courses des taureaux)। ১৮৩১-এর অগস্টে লে ভোলয়র (Les voleurs) এবং ১৮৩৩-এর ডিসেম্বরে লে সরসিয়্যার (Les Sorcieres) নামে চারটি চিঠি রেভ্যু দ্য পারিতে প্রকাশিত হয়। এই সব প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায় যে পর্যটক মেরিমের কাছে গল্পলেখক মেরিমে কতটা ঋণী। মেরিমে নের্ভাল অথবা হফ্‌মানের মতো খেয়ালি ও কল্পনাপ্রবণ নন, লামার্তিনের মতোও কবিও নন, গতিয়ের মতো শিল্পীও নন। মেরিমে পল্লবগ্রাহী (Dilettante)। স্পেনের মানুষের প্রকৃতি, আচার-আচরণ ও ভাষা সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল। স্পেনের মানুষ ও অন্যান্য বস্তুকে তিনি যথাযথভাবে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। কখনো পায়ে হেঁটে কখনো ঘোড়ার গাড়িতে, কখনো ঘোড়ায় অথবা খচ্চরে চেপে তিনি খুঁজে বেড়াতেন এমন বস্তু যা স্বাদু ও ঝাঁঝাল। নারীদেহে আসক্ত এই লেখক সব পরিবেশেই মেয়েদের খুঁজে বেড়াতেন। তিনি বলতেন যে, তিনি সেভিলের যাতাদরের সঙ্গে ডিনার খেয়েছেন এবং তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিল তরেয়াদর। খচ্চরচালক এবং এই ধরনের আরো অনেক মানুষ যাদের দিকে কোনো ইংরেজ পর্যটক ফিরেও তাকাতেন না।

একথা বলার অর্থ এই নয় যে তিনি উচ্চবর্গের সমাজকে এড়িয়ে যেতেন। একেবারেই না। ঘটনাক্রমে তাঁর সঙ্গে মুক্তপন্থী তেবার কাউন্টের আলাপ হয়ে ছল।

কাউন্ট তাঁকে তাঁর স্ত্রী কঁতেস দ্য মন্তিজোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যাঁর মাধুর্য ও পাণ্ডিত্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর ছয় ও চার বছরের দুটি মেয়ের মধ্যে ছোট ইউজেনিয়া। ইউজেনিয়ার গভীর নীল চোখে ছিল গর্ব ও অস্বস্তিভরা দৃষ্টি। মেরিমের "হাঁটুর মধ্যে মুখরেখে সে নিজেকে মুছে ফেলতে চাইত। মেরিমে তাঁর সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে দিতেন, তাকে গল্প শোনাতেন।" পরবর্তীকালে এই মেয়েটিকে পারিতে দেখা যাবে ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী হিসেবে। যে তাঁর গ্রেনাডার পুরনো অতিথিকে সাম্রাজ্যের সেনেটের সদস্য ও তিয়েরি প্রাসাদের অন্তরঙ্গ হিসেবে কাছে টেনে নেবে।

এই প্রথম ভ্রমণের দশ বছর পরে মেরিমে দ্বিতীয়বার স্পেনে গিয়েছিলেন স্বল্পকালের জন্য। ১৮৪০-এর অগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে তিনি মাদ্রিদ, কারাবানসেল, বুর্গোস ভিত্তোরিয়া ভ্রমণ করেন। মাদ্রিদের প্রাসাদে তিনি কাঁতস দ্য মন্তিজোর আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে স্থির হয়ে থাকেননি। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গবেষণা করেন; নানা স্মৃতিসৌধ পর্যবেক্ষণ করেন, পুরনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটেন ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের ব্যবসায়ীর কাছে তাঁর প্রয়োজনীয় বস্তু খুঁজে বেড়ান, আবার ফিরে আসেন মাদ্রিদে। তারপর পুস্তক থেকে আহৃত জ্ঞানের এবং ব্যক্তিগত স্মৃতির ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে ফ্রান্সে ফিরে যান। পনের বছর পরে মননের এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত হয় কারমেন।

কারমেনের বিষয়বস্তু—একবার স্পেনে পর্যটনের সময় লেখক মুণ্ডার যুদ্ধক্ষেত্রের স্থানটি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সেখানে এক উপত্যকায় এক বদমেজাজী অশ্বারোহীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাঁকে সিগার দিয়ে তুষ্ট করেন। কিন্তু লেখকের গাইড অশ্বারোহীকে চিনতে পারে। অশ্বারোহী কুখ্যাত দস্যু ডন জোসে। তার মাথার একটা দাম ধার্য করেছিল সরকার এবং পুলিশ তাকে খুঁজছিল। গাইড তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশে খবর দেয় কিন্তু পুলিশ আসার আগেই সে পালিয়ে যায়। কারণ লেখক তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

কিছুকাল পরে এই দস্যুর সঙ্গে লেখকের আবার দেখা হয় কর্দোভাতে চেদেনি কারমেনচিতার ঘরে। তারপর দেখা হয় জেলে। সেখানে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দস্যু লেখককে নিজের জীবনের কাহিনী শোনায়, তা হলো:

"একটা ঝগড়ার ফলে আমার জন্মভূমি বাস্ক থেকে আমাকে চলে আসতে হয়। স্পেনে এসে আমি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিই। আমার যখন সার্জেন্টের পদে প্রোমোশনের সময় হয়ে এসেছিল, তখন একটা ঘটনা ঘটে গেল যা আমার জীবনকে পাল্টে দিল। একদিন আমি একটা সিগার তৈরির কারখানায় পাহারা দিচ্ছিলাম। সেদিন কারমেন নামে এক সিগার প্রস্তুতকারিণী তার এক সঙ্গিনীকে আহত করে।

কারমেনকে জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় তার রূপে ও কথায় মুগ্ধ হয়ে আমি তাকে পালিয়ে যেতে দিয়েছিলাম। ফলে আমার পদাবনতি ও জেল হয়। জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য কারমেন আমাকে একটা রুটির মধ্যে একটা উখা ও স্বর্ণমুদ্রা পাঠায়। কিন্তু আমি জেল থেকে পালাইনি। জেল থেকে ছুটি পেয়ে আমি তার সঙ্গে একটা আনন্দমুখর দিন কাটাই। তারপর থেকে আমি আর তাকে ভুলতে পারিনি।

একদিন শহরের প্রাচীরের একটা ভাঙা জায়গায় পাহারা দিচ্ছিলাম। সেখানে কারমেনকে চোরাইচালানকারীদের সঙ্গে দেখলাম। এই দলটাকে আমি যেতে দিলাম। তারপর কারমেনের ঘরে আমার লেফটেনান্টকে আমি হত্যা করি এবং চোরাইচালানকারীদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হই। একদিন ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে আমি কারমেনের স্বামীকে হত্যা করি এবং আমি তার স্থান দখল করি। কিন্তু কারমেন যখন এক পিকাদরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন আমি তাকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যাওয়ার প্রস্তাব করি। সে রাজি হল না। বরং স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সে আর আমাকে ভালবাসে না। তারপর আমি তাকে একটা গিরিসংকটে হত্যা করি এবং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করি।”

অতিশয় সরল ও স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহ। নারীর প্রেমে সম্মোহিত পুরুষের কাহিনী। কারমেন সৈনিকের মুখে একটা বাবলা ফুল ছুড়ে মেরেছিল। সেই মুহূর্তেই এই সৈনিকের মৃত্যু হয়েছিল। সে তা জানত। সে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল, এই প্রেম তার নিয়তি, একে প্রতিরোধ করার শক্তি নেই তার কারণ এ এক রহস্যময় শক্তির আকাঙ্ক্ষিত। রাসিন, আরেব প্রেভোস্তের মতো লেখকেরা যাঁরা মানবহৃদয়ের বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই দুঃখবাদী প্রত্যয়ে পৌঁছেছেন। কারমেন হয়তো মিথ্যাবাদী ছিল, ডন জোসেও হয়তো জানত, সে মিথ্যাবাদী ; এই স্বেচ্ছাচারিণী তার প্রতি চারবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং ডন জোসেও চারবার বিদ্রোহ করেছিল ; যে তাকে ভালবাসে তাকে হয়তো কারমেন বিদ্রূপ করত এবং বারবার তার এই নিষ্ঠুরতায় ডন জোসে ক্রোধে অধীর হয়ে উঠত ; কারমেন হয়তো অনুভূতিশূন্য ছিল, অপরের দুঃখে হয়তো তার হাসি পেত এবং ডন জোসে তাতে রুষ্ট হত — সে যাইহোক না কেন সেই চরম মুহূর্তে ডন জোসেকে মাথা নোয়াতে হল। “আমি তাকে বললাম, তুই শয়তান।” সে উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ’। এই উত্তর গল্পটিতে এক ধরনের প্রচণ্ডতা এনে দেয়।

ধ্রুপদী পদ্ধতিতে নির্মিত এই গল্প। লেখক গল্পের উপসংহার করেছেন বেদেদের সংস্কৃতি ও ভাষাবিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে। এতে গল্পের বিষয় সম্পর্কে লেখকের নিরাসক্তি প্রকাশিত। তবু ফরাসি সাহিত্যে সবচেয়ে ইঙ্গিতবহ প্রেম ও

মৃত্যুর গল্প কারমেন। বিজে-র (Biget) বিখ্যাত অপেরা কারমেনের Libretto (বাচনাংশ) মেইলাক ও হ্যালেভি (Meihlac et Halevy) এই গল্প থেকেই নিয়েছেন।

মেরিমে ও কারমেন—এই নায়িকাকে মেরিমে কোথায় পেলেন? একথা সবাই জানেন যে কলঁবার একটি অনন্য মডেল ছিল। কিন্তু কারমেনের কোনো মডেল ছিল না। মেরিমে নিজেই তা বলেছেন। তিনি কঁতেস দ্যু মন্তিজোকে লেখেন (১৬মে ১৮৪৫), "আপনি পনের বছর আগে আমাকে যে কাহিনীটি বলেছিলেন, ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি আট ঘণ্টায় তা লিখে ফেলেছি। আমি হয়তো কাহিনীটিকে বিকৃত করে ফেলেছি, এই সংশয় আমার আছে। ঘটনাটা মালাগার এক মরদের। সে তার রক্ষিতাকে খুন করে.... কিছুকাল সযত্নে আমি বেদেদের কাহিনী পড়েছিলাম। আমার নায়িকাকে আমি বেদেনী বানিয়েছি"। বেদেদের সম্পর্কে নানা তথ্য আহরণ করে লেখক কারমেনে তা কাজে লাগিয়েছিলেন। কারমেনে যেসব ঘটনার কথা তিনি লিখেছেন, তার কোনোটাই তিনি প্রত্যক্ষ করেননি। অথচ তাঁর গল্প বলার কুশলতা থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে স্পেন পর্যটনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই গল্পে আহৃত হয়েছে।

বস্তুত, মাদাম দ্য মন্তিজোকে লেখা আর একটি চিঠি (১৬ নভেম্বর ১৮৪৪) থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি একটি সুন্দরী জিতানার সঙ্গে ফ্লার্ট করেছিলেন। 'লে সরসিয়্যার' নামে যে লেখাটি তিনি রেভ্যু দ্য পারিতে ছেপেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন যে মুরাভিদ্রোর কাছে একটি কাবারেতে তিনি মাদমোয়াজেল কারমেনচিতার তৈরি একটি গাজপাসো খেয়েছিলেন। এই কারমেনচিতা "বেশ সুন্দরী বেশি তামাটেও নয়।" তাঁর স্কেচের অ্যালবামে মেরিমে তার একটি প্রতিকৃতিও এঁকেছিলেন। তাছাড়া আমরা এও জানি যে মাদাম দ্য মন্তিজোর দেওর একটি সিগারেরার (সিগারপ্রস্তুতকারিণীর) শিকার হয়েছিলেন। হয়তো এই সব মডেল থেকে তিনি বেশ কিছু তথ্য আহরণ করেছিলেন। তবে যিনি কারমেনকে সৃষ্টি করেছিলেন "তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভার কথা ভুললে চলবে না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির জন্য তা আবশ্যিক।"

গল্পলেখক মেরিমের নিজস্ব প্রেমের কাহিনীর কথাও মনে রাখতে হবে। স্পেনে দ্বিতীয়বার পর্যটনের সময় তাঁর ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা ও তিক্ততা কারমেনের মধ্যে 'মূর্ত হয়েছিল'। প্রেমের যে যন্ত্রণায় তিনি পুড়ছিলেন, কারমেন সেই মৃত কামনার, সেই দুঃখের সেই অবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি.....ভালবাসার সেই পুরনো যন্ত্রণা ফিরে এসেছিল এক যুবতী বেদেনীর ছদ্মবেশে। কিন্তু যদিও তিনি মাদাম লাকস্ত, মাদাম দ্য ল্যমেরকে জড়াতে চাননি, তবু কারমেনের স্রষ্টার মধ্যে হয়তো সেই পুরনো

পীড়া আরো বেশি দুঃখময় হয়ে উঠেছিল। ঠিক যেভাবে পিরিনিজের অন্য দিকের মানুষেরা ভালবাসে যাদের ভালবাসা পাশব, নির্মম; যা মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যায়, সেইভাবে ভালবাসতে না পারার দুঃখ হয়তো তাঁর ছিল। কারমেনকে সৃষ্টি করে মেরিমে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কারমেনের মধ্যে আমরা অনায়াসে চিনতে পারি তার স্রষ্টাকে। কোনো মডেলকে নয়। মেরিমেই কারমেন।

১০.১.৯৪ প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

।। এক ।।

যত নারী সব পিত্তের মতো তেতো
ওদের মোহন মুহূর্ত মাত্র দুটি—শয্যায় আর মৃত্যুতে।
—পাল্লাদাস।[১]

মারবেল্লার প্রায় ছ-মাইল দক্ষিণে বর্তমানে মঁদার কাছাকাছি বাস্তলিপেলি অঞ্চলে ভৌগোলিকরা যখন মুন্দার[২] যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান নির্দেশ করেন, আমার সন্দেহ হয়—তখন তাঁরা কী বলছেন নিজেরাই জানেন না। অজ্ঞাতনামা লেখকের বেল্লুম হিসপেনিয়েনসি পুঁথির[৩] নিজস্ব পাঠ অনুসারে এবং দ্যুক দ্য ওসুনার[৪] চমৎকার লাইব্রেরিতে সংগৃহীত কিছু তথ্যের ভিত্তিতে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, সিজার যেখানে প্রজাতন্ত্রের সমর্থকদের বিরুদ্ধে বাজিমাতের চাল চেলেছিলেন, সেই স্মরণীয় স্থানটি মন্তিল্লার আশেপাশে খুঁজতে হবে। ১৮৩০-এর হেমন্তকালে আমি আন্দালুসিয়ায় ছিলাম। এ বিষয়ে আমার সন্দেহটুকু মেটাবার জন্য তখন বেশ বিস্তৃত অভিযান করেছিলাম। অচিরেই আমার যে পুস্তিকা বেরোবে, তাতে তথ্যনিষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনে এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা থাকবে না। অপেক্ষা করে আছি, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ভৌগোলিক সমস্যা কন্টকিত হয়ে আছেন, আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে অবশেষে তার সমাধান হবে। এই অবসরে আপনাদের একটি ছোটগল্প শোনাতে চাই। মুন্দার যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কিত কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নটিকে

১। আলেকজান্দ্রিয়াবাসী গ্রিক কবি ও বৈয়াকরণ।

২। স্পেনের প্রাচীন শহর। এখানে ৪৫ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজার লারিয়েনাস ও পম্পের দুই ছেলে ক্লিইয়াস ও সেক্সটাসকে পরাজিত করেন।

৩। বেল্লুম হিসপেনিয়েনসির লেখকের নাম অজ্ঞাত। মেরিমে লিখেছেন: বেল্লুম হিসপেনিয়েনসি সিজার বা তাঁর সেক্রেটারি হির্তিয়াসের লেখা নয়। বইটি রোমান কিংবা স্পেনীয়ের লেখা—সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৪। দ্যুক দ্য ওসুনা স্পেনের একটি বিখ্যাত অভিজাত বংশোদ্ভূত।

এই গল্পটি কোনোভাবেই প্রভাবিত করবে না।

কার্দোভা থেকে দুটি ঘোড়া ও একটি গাইড নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। সঙ্গে মালপত্র বলতে সিজারের কমেন্টারি[৫] ও খানকয়েক সার্ট। একদিন কাসেনার সমতলভূমির উঁচু ঢিবিগুলোতে ঘোরাঘুরি করে ক্লান্তিতে ও পিপাসায় মৃতপ্রায় হয়ে ভাবছিলাম—সিজার ও পম্পে বংশাবতংসরা এখন জাহান্নমে যাক। এমন সময় আমার পথ থেকে বেশ কিছু দূরে বেত ও শর-বনে ভর্তি সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ চোখে পড়ল। বুঝতে পারলাম আশেপাশে কোথাও ঝরনা রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলাম দূর থেকে যা মাঠ বলে মনে হয়েছিল, আসলে তা একটা জলা। জলাটার মধ্যে একটা ছোট নদী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সিয়েরা দ্য কাব্রার দুটি উত্তুঙ্গ পর্বত-প্রাচীরের মাঝখানের সংকীর্ণ গিরিসংকট থেকে ঝরনাটা নেমে এসেছে। ভাবলাম আরও ওপরে উঠলে ব্যাঙ ও জোঁক ছাড়া নির্মল জল, হয়তো বা পাথরের আড়ালে একটু ছায়াও মিলতে পারে। গিরিসংকটের মুখে আসতেই আমর ঘোড়াটা ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টির বাইরে আর একটা ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করল। একশ 'পা না যেতেই দেখলাম গিরিবর্ত্মটি হঠাৎ বিস্তৃত হয়ে একটি স্বাভাবিক অ্যামপিথিয়েটারে পরিণত হয়েছে। চারদিকে সমুচ্চ পর্বতের বেষ্টনীতে স্থানটি ঘন ছায়াসমাচ্ছন্ন। কোনো পথিকের পক্ষে এর চেয়ে আরামদায়ক বিশ্রামস্থান দুর্লভ। খাড়া পাহাড়ের নিচ থেকে ঝরনাটা উচ্ছ্রিত হয়ে একটা ছোট জলাশয়ে নেমে এসেছে। জলাশয়ের তীরদেশে তুষারশুভ্র বালির কার্পেট বিছানো। ঝরণাধারায় পুষ্ট ও হাওয়ার ঝাপটা থেকে আশ্রিত পাঁচ-ছটি সবুজ, সুন্দর ছোট ওকগাছ ছোট নদীটির ওপর নিবিড় ছায়া মেলে দিয়েছে। চারপাশে শয্যা রচনা করেছে চিক্কণ উজ্জ্বল তৃণ। ত্রিশ মাইলের মধ্যে কোনো সরাইয়ে এমন উপভোগ্য শয্যা মিলবে না।

অবশ্য এমন রমণীয় স্থান আবিষ্কারের গৌরব আমার নয়। আগে থেকেই একটা লোক সেখানে বিশ্রাম করছিল। আমি যখন সেখানে ঢুকলাম, তখন লোকটি যে ঘুমোচ্ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে জেগে উঠে লোকটি তার ঘোড়াটির দিকে এগিয়ে এল। ঘোড়াটা প্রচুর নিদ্রার সুযোগে চারপাশের ঘাসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছিল। এই নওজোয়ানের দোহারা গড়ন, কিন্তু আকৃতি সবল। চোখে গর্বিত ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। এক সময়ে গায়ের রঙ ফরসা ছিল, কিন্তু রোদে পুড়ে এখন সেই রঙ তার মাথার চুলের চেয়েও তামাটে। লোকটি এক হাতে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল, অন্য হাতে তুলে নিল তামার বন্দুক। স্বীকার করতে বাধা নেই যে, প্রথম দিকে বন্দুকও বন্দুক-অলার ভয়ানক ধরন-ধারণ দেখে আমি একটু

৫। জুলিয়াস সিজার লিখিত Commentaries on the Civil War সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলাম। এদেশে ডাকাতের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু কখনও চোখে দেখিনি। তাই তাদের অস্তিত্বে আমি আস্থা হারিয়েছি। তা ছাড়া এদেশে এত সৎ গৃহস্থকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রণসাজে সেজে হাটে যেতে দেখেছি যে, একটি আগ্নেয়াস্ত্র দেখে অপরিচিতের নৈতিকচরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা অনুচিত মনে করলাম। মনে মনে বললাম, ও আমার সার্ট আর এলজেভিরের কমেন্টারি[৬] নিয়ে করবেই বা কী? অতএব বন্দুকধারীকে সহজভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে নমস্কার জানালাম। হাসিমুখে বললাম,—আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করলাম বোধ হয়। কোনো উত্তর না দিয়ে লোকটি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারপর যেন পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে আমার গাইডকে অনুরূপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করল। গাইড এগিয়ে আসছিল। দেখলাম সে হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে থমকে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া। বিপজ্জনক সাক্ষাৎকার,—স্বগতোক্তি করলাম। কিন্তু বুদ্ধি করে আশঙ্কার কোনো লক্ষণ দেখালাম না। ঘোড়া থেকে নেমে গাইডকে ঘোড়ার রাশ খুলে দিতে বললাম। ঝরনার কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে মাথা ও দু-হাত ডুবিয়ে দিলাম। তারপর জিদিওনের অবাধ্য সৈনিকদের[৭] মত উপুড় হয়ে শুয়ে আকণ্ঠ জল পান করলাম।

গাইড ও অপরিচিত লোকটির প্রতি নজর রাখলাম। গাইড নেহাত অনিচ্ছায় এগিয়ে এল। লোকটির কিন্তু আমার বিরুদ্ধে বদ মতলব আছে বলে মনে হল না। কারণ সে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছিল আর তার বন্দুকটার মুখ এখন মাটির দিকে। এতক্ষণ সে সেটাকে সোজাসুজি উঁচিয়ে ধরেছিল।

ভাবলাম লোকটি আমাকে একটুও গ্রাহ্য করল না দেখে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোনো মানে নেই। তাই ঘাসের ওপর দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বন্দুকধারীর কাছে দেশলাই আছে কি না জিজ্ঞাসা করলাম। আর আমার সিগারকেস বার করলাম। অপরিচিত লোকটি কোনো কথা না বলে পকেট হাতড়ে দেশলাই বার করল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সিগার ধরিয়ে দিতে। বোঝা গেল লোকটি ক্রমে সহজ হচ্ছে। বন্দুকটা তখনও

৬। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ওলন্দাজ পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক এলজেভির ভ্রাতাদের দ্বারা প্রকাশিত কমেন্টারির সংস্করণ।

৭। বাইবেলে (জাজেস ২য়) আছে যে ইজরায়েল সন্তানদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর তাঁদের সাত বছরের জন্য মিদিয়ানাইটদের হাতে সমর্পণ করেন। পরে মিদিয়ানাইটদের অত্যাচারে পীড়িত ইজরায়েল সন্তানদের ক্রন্দনে দ্রবীভূত হয়ে ঈশ্বর জিদিওনের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁকে ইজরায়েল সন্তানদের রক্ষা করতে বলেন। মিদিয়ানাইটদের সঙ্গে যুদ্ধের আগে জিদিওন ঈশ্বরের আদেশে তাঁর বত্রিশ হাজার সৈনাকে পরীক্ষা করে মাত্র তিনশ জনকে বেছে নেন। বত্রিশ হাজারের মধ্যে এই তিনশ সৈনাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তৃষ্ণার্ত হওয়া সত্ত্বেও হাঁটু গেড়ে বসে বা উপুড় হয়ে শুয়ে জর্ডনের জলপান করেনি। হাতের তালুতে জল নিয়ে সেই জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। এই সামান্য সংখ্যক সৈনা দিয়েই জিদিওন মিদিয়ানাইটদের পরাজিত করেছিলেন।

হাতে থাকলেও সে আমার মুখোমুখি বসল। আমার সিগার ধরিয়ে বাকি সিগারগুলোর মধ্যে সেরা সিগারটা বেছে নিয়ে সে ধূমপান করে কি না জিজ্ঞাসা করলাম।

—হ্যাঁ মঁসিও—লোকটি উত্তর দিল।

এই প্রথম কথা শুনলাম ওর মুখে। লক্ষ্য করলাম লোকটি ওর 'এল'-গুলো আন্দালুশীয়দের মতো উচ্চারণ করছে না। তা থেকে আন্দাজ করলাম, সে আমার মতই পথিক। তবে অর্নাতপ্রত্নতাত্ত্বিক। একটি আসল হ্যানাভা রিগালিয়া দিয়ে বললাম, এটা আপনার বেশ ভাল লাগবে। অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা সামান্য নুইয়ে লোকটি আমার সিগার থেকে ওর সিগার ধরাল। তারপর সিগারে প্রথম টান দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, —আঃ, কত দিন সিগারে টান দিইনি।

প্রাচ্যদেশে নুন ও রুটি গ্রহণ করার মতো স্পেনে সিগার আদান-প্রদান অতিথ্যসম্পর্ক স্থাপন করে। লোকটি এখন বেশ কথাবার্তা বলতে লাগল—যা আমি আশা করিনি। নিজেকে মন্তিল্লা প্রদেশের অধিবাসী বলে পরিচয় দিলেও এই জায়গাটা তার বিশেষ পরিচিত বলে মনে হল না। আমাদের আশ্রয়স্থল এই মনোরম উপত্যকার নামও তার জানা নেই। আশেপাশের কোনো গ্রামের নামও সে বলতে পারল না। কাছাকাছি কোনো প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ, তেরছা বড় টালি কিংবা খোদাই-করা পাথর তার চোখে পড়ছে কি না জানতে চাইলাম। সে স্বীকার করল এসব ব্যাপারে তার কোনো উৎসাহ নেই। অন্যদিকে ঘোড়া সম্পর্কে সে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে প্রমাণ করল। আমার ঘোড়াটার খুঁতগুলো দেখিয়ে দিল। অবশ্য সেটা কিছু কঠিন ছিল না। নিজের ঘোড়াটার বংশপরম্পরা বর্ণনা করল। ঘোড়াটা কর্দোভার বিখ্যাত অশ্বশালার। সত্যিকারের তেজী ঘোড়া। একেবারে ক্লান্তিহীন। প্রভু ঘোড়াটার প্রশস্তি করলেন,—একবার ঘোড়াটা একদিনে নব্বুই মাইল ছুটেছিল। কথাটা বলতে বলতে সে কথার মাঝখানে হঠাৎ বিস্মিত বিরক্তিতে থেমে গিয়েছিল। যেন অনেক বেশি বলা হয়ে গেছে। পরে একটু বিব্রতভাবে ব্যাখ্যা করল—সেবার কর্দোভা যাওয়ার তাড়া ছিল। একটু কেসে বলল, জজের আদালতে সওয়াল করার কথা ছিল। এই বলে আমার গাইড আন্তেনিওর দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিল।

ছায়া ও ঝরনা আমাকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে গাইডের থলিতে আমার মন্তিল্লার বন্ধুদের দেওয়া কয়েক টুকরো চমৎকার হ্যামের কথা মনে পড়ল। গাইডকে সেগুলো বার করতে বলে অপরিচিত লোকটিকেও এই সদ্য-আয়োজিত পিকনিকে যোগ দিতে ডাকলাম। যদি সে দীর্ঘকাল ধূমপান না করে থাকে, অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সে নিশ্চয়ই কিছু খায়ওনি। লোকটি নেকড়ের মতো গিলতে লাগল। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা এই গরিব হতভাগার ভাগ্যে শিকেছেঁড়ার মতো হয়েছিল। কিন্তু আমার গাইড খেলো সামান্য, পান করল আরও কম। আর একেবারে নিশ্চুপ

হয়ে রইল। অথচ যাত্রারম্ভে ওকে একজন অপরাজেয় বাক্যবিশারদ বলে মনে হয়েছিল। আমাদের অতিথির উপস্থিতিই ওকে ভাবিত করেছে। পারস্পরিক সন্দেহ দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল। কারণটা তখনও নিশ্চিত বুঝতে পারিনি।

ইতিমধ্যে রুটি ও হ্যামের শেষ টুকরো পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আমরা দুজনেই আমাদের দ্বিতীয় সিগার শেষ করেছি। গাইডকে ঘোড়ার রাশ লাগাতে বলে আমি আমার নতুন বন্ধুর কাছে বিদায় নিতে চাইলাম। আমি কোথায় রাত কাটাব সে জানতে চাইল। গাইডের ইশারা লক্ষ্য করার আগেই বলে ফেললাম,—আমি কুয়েরডোর সরাইয়ে যাচ্ছি।

—মঁসিও, ওটা আপনার মতো লোকের উপযুক্ত জায়গা নয়। আমিও সেখানেই যাচ্ছি। অনুমতি দেন তো আমরা একসঙ্গেই যেতে পারি।

সাগ্রহে সম্মতি জানিয়ে আমি ঘোড়ার সওয়ার হলাম। গাইড আমার ঘোড়ার পা-দান ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে আবার চোখ ইশারা করল। প্রত্যুত্তরে আমি শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম। ওকে জানাতে চাইলাম—আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত আছি। আমরা রওনা হলাম।

আন্তোনিওর রহস্যময় ইশারা ও আতঙ্ক, অপরিচিতের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকটি কথা, বিশেষ করে সেই নব্বুই মাইলের দৌড় ও তার অবিশ্বাস্য ব্যাখ্যা—এই পথিকসঙ্গী সম্পর্কে আমার ধারণা গড়ে তুলেছিল। সন্দেহ রইল না যে, কোনো চোরাইচালানকারী, হয়তো বা কোনো ডাকাতের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? আমার সঙ্গে খেয়েছে ও ধূমপান করেছে এমন লোকের কাছ থেকে আমার কোনো ভয় নেই—এটুকু বুঝতে পারার মতো স্পেনীয় চরিত্রের জ্ঞান আমার হয়েছিল। বরং লোকটির উপস্থিতি যে-কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রক্ষাকবচের মতো। তা ছাড়া, ডাকাত কী রকম হয় দেখতে পেয়ে এটুকু উল্লসিতই হয়ে উঠলাম। ওদের সঙ্গে তো আর হামেশাই দেখা হয় না। এই ভয়ঙ্কর মানুষের সঙ্গের একটা মোহ আছে—বিশেষত যখন সে শান্ত ও পোষমানা অবস্থায় থাকে।

আশা ছিল ক্রমে এই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটি আমাকে সব খুলে বলবে। তাই গাইডের চোখের ইশারা সত্ত্বেও ডাকাতদের সম্পর্কে কথাবার্তা চালাতে লাগলাম। সকলের মুখে তখন আন্দালুশিয়ার কুখ্যাত দস্যু জোসে মারিয়ার কথা। স্বগতোক্তি করলাম,—আহা! যদি জোসে মারিয়াই আমার পাশে থাকত! এই বীরটির যে-সব প্রশংসনীয় কীর্তির কথা আমার জানা ছিল,—বললাম। পঞ্চমুখ হয়ে উঠলাম এই দস্যুর বীরত্ব ও মহানুভবতার প্রশংসায়। কিন্তু অপরিচিতের নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর শুনলাম, জোসে মারিয়া একটি বদমাস।

এ কি ন্যায় বিচার না অতি বিনয়? মনে মনে বললাম, আমার সঙ্গীটিকে এবার

ভাল করে লক্ষ্য করলাম। ওর চেহারা মিলিয়ে নিলাম আন্দালুশিয়ার নানা শহরের দরজায় আঁটা জোসে মারিয়ার চেহারার বিবরণের সঙ্গে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এই সে। কটা চুল, নীল চোখ, সুন্দর দাঁত, বড় মুখ, ছোট হাত ; মিহি সার্ট, রুপোর বোতাম-অলা ভেলভেটের ভেস্ট, পায়ে সাদা চামড়ার পট্টি ও তামাটে রঙের ঘোড়া। না, আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর ছদ্মবেশ আমরা মেনে চলব।

সরাইয়ে পৌঁছোলাম। সরাইয়ের চেহারা লোকটির বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। অর্থাৎ এমন জঘন্য সরাই আগে কখনও আমর চোখে পড়েনি। একটিমাত্র বড় ঘর—একধারে রান্নাঘর, খাবার-ঘর ও শোবার ঘর। ঘরের মধ্যিখানে একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর আগুন জ্বালানো হয়েছে। ছাদের একটি ফুটো দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। বরং বলা যেতে পারে ধোঁয়াটা মেঝের কয়েক ফুট ওপরে মেঘের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকে। দেয়ালের ধার ঘেঁসে মেঝেয় পাঁচ-ছটি পুরনো কম্বল বিছানো। ওগুলো পথিকদের বিছানা। বাড়ি অর্থাৎ এই সদ্যবর্ণিত ঘরটি থেকে বিশ পা দূরে একটি চালাঘরের মতো রয়েছে। ওটা আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই মনোরম আশ্রয়ে আপাতত একটি বৃদ্ধা ও দশ-বার বছরের ছোট মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না। দুজনেরই রঙ ঝুলের মত কালো। পরনো নোংরা শতচ্ছিন্ন কাপড়। মনে মনে বললাম, এই তাহলে প্রাচীন মুন্দাবিতিকার জনসংখ্যার অবশেষ। সিজার! সেক্স্টাস্ পম্পে। আবার এ জগতে ফিরে এলে তোমাদের বিস্ময়ের কি আর অন্ত থাকবে ?

আমার সঙ্গীকে দেখে বুড়িটার মুখ থেকে বিস্মিত উক্তি বেরিয়ে এল, সিনর ডন জোসে যে !

ডন জোসে ভ্রূকুটি করে শাসনের ভঙ্গিতে হাত তুলতেই বৃদ্ধা থমকে চুপ করল। গাইডের দিকে তাকালাম। সকলের অলক্ষ্যে ইঙ্গিতে ওকে বুঝিয়ে দিলাম, যে লোকটির সঙ্গে রাত কাটাতে যাচ্ছি, তার সম্পর্কে আমার আর কিছু জানতে বাকি নেই।

নৈশভোজন কিন্তু আশাতিরিক্ত ভাল হল। এক ফুট উঁচু একটা ছোট টেবিলে খাবার দেওয়া হল। ভাত ও অগুন্তি লঙ্কা সহযোগে একটা ভাজা মোরগ, তেল-লঙ্কা ও এক ধরনের লঙ্কার স্যালাড। লঙ্কাচর্চিত এই ধরনের তিনটি প্লেট গলাধঃকরণের জন্য বারবার চামড়ার বোতলে ভরা মন্তিল্লার মদের শরণ নিতে হচ্ছিল। মন্তিল্লার এই মদ কিন্তু পরম উপাদেয়। খাওয়া-দাওয়ার পর দেয়ালে একটি ম্যান্ডোলিন ঝোলানো দেখে (স্পেনের সর্বত্র ম্যান্ডোলিন ছড়ানো) পরিবেশনকারিণী ছোট মেয়েটিকে সে ম্যান্ডোলিন বাজাতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করলাম।

—না। ডন জোসে কিন্তু বেশ ভাল বাজান, মেয়েটি উত্তর দিল। আমি জোসেকে বললাম, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে কিছু গেয়ে শোনান। আমি আপনাদের

জাতীয় সঙ্গীতের ভয়ানক ভক্ত।

—আপনি সদাশয় ভদ্রলোক, আমাকে অকাতরে সিগার বিলিয়েছেন। আপনাকে না বলার ক্ষমতা আমার নেই,—খোস মেজাজে ডন জোসে উত্তর দিল। ম্যান্ডোলিনটা দেওয়া হলে সে নিজেই বাজিয়ে গাইতে লাগল। বিষাদভরা একটা অদ্ভুত সুর। গানের একটি শব্দও আমি বুঝতে পারিনি।

আমি বললাম,—আমার হয়তো ভুল হতে পারে। আপনি এখন যে গানটি গাইলেন তা স্পেনীয় গান নয়। প্রঁভসের[৮] দিকে জর্জিকো[৯] শুনেছি অনেকটা তার মত। আর কথা নিশ্চয়ই বাস্‌ক্ ভাষায়।

—হ্যাঁ, জোসে থমথমে গলায় উত্তর দিল। তারপর ম্যান্ডোলিনটা মেঝেয় রেখে এক আশ্চর্য বিষাদাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নিভন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট টেবিলের ওপরের ল্যাম্পের আলো ওর মুখে পড়েছে। একাধারে মহৎ ও দুর্ধর্ষ ওর আকৃতি মিলটনের শয়তানের কথা মনে করিয়ে দেয়। হয়তো তারই মতো আমার সঙ্গীও তার ফেলে-আসা স্বর্গের কথা ভাবছে; কোনো স্খলনের জন্য যে স্বর্গ থেকে সে নির্বাসিত। কথাবার্তা চালাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। জোসে তখন তার বিষাদচিন্তায় মগ্ন।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধা ঘরের কোণে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। দড়িতে ঝোলানো একটি চাদর তার আব্রু রক্ষা করছে। কুলললনাদের জন্য এই সুরক্ষিত অন্তঃপুরে ছোট মেয়েটিও বৃদ্ধার অনুগামিনী হল। আমার গাইড তখন দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে তার সঙ্গে আস্তাবলে যেতে বলল। গাইডের কথায় ডন হেসে চমকে সজাগ হয়ে উঠল। রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করল, সে কোথায় যাচ্ছে?

—আস্তাবলে। গাইড উত্তর দিল।

—কেন ? কী দরকার? ঘোড়াগুলোর খেতে হবে তো? এখানেই ঘুমোও। মঁসিও আপত্তি করবেন না।

—আমার আশঙ্কা হচ্ছে ওঁর ঘোড়াটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওঁকে ঘোড়াটা দেখাতে চাই। কী করা দরকার উনি বলতে পারবেন হয় তো।

স্পষ্ট বুঝলাম আন্তোনিও আমার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু ডন জোসের সন্দেহ উদ্রেক করার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতিতে ডন জোসের প্রতি গভীর আস্থাসূচক ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে হল। আন্তোনিওকে বললাম, ঘোড়ার ব্যাপারে আমি কিছু বুঝি না। তাছাড়া, আমার ঘুম পেয়েছে।

৮। স্পেনের বিশেষ অধিকারভোগী অঞ্চল। আলভা, বিস্কে, গিপাজকোয়া ও ন্যাভাড়ের কিয়দংশ নিয়ে এই অঞ্চল—মেরিমের পাদটীকা।

৯। সঙ্গীতযুক্ত এক জাতীয় নাচের সুর।

ডন জোসে গাইডকে আস্তাবলে অনুসরণ করল এবং অল্পক্ষণ পরেই একা ফিরে এল। আমাকে বলল, ঘোড়াটার কিছু হয়নি। কিন্তু আপনার গাইডের কাছে ঘোড়াটা এতই মূল্যবান যে, সে ঘোড়াটার ঘাম বার করবার জন্য ভেস্ট দিয়ে ঘোড়াটাকে ক্রমাগত ঘষছে, আর এই মজার কাজে সারারাত কাটাবে বলে স্থির করেছে। যা হোক, বিছানার ছোঁয়াচ এড়াবার জন্য ওভারকোটে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কম্বলের ওপর শুয়ে পড়লাম। আমার পাশে শোয়ার বেয়াদবির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ডন জোসে দরজার সামনে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার আগে বন্দুকটা টোটা ভর্তি করে সে হ্যাভারস্যাকের নিচে রাখল। হ্যাভারস্যাকটাই ওর বালিশের কাজ করবে। পরস্পরকে "শুভরাত্রি" জানাবার পাঁচ মিনিট পরেই আমরা গভীর নিদ্রাভিভূত হলাম।

ভেবেছিলাম অত্যধিক পথশ্রমে এমন স্থানেও নিদ্রা সম্ভব হবে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে গায়ে বিশ্রী চুলকুনিতে প্রাথমিক ঘুমটা ভেঙে গেল। চুলকুনির কারণ বুঝতে পেরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। এই অতিথিবিমুখ ঘরের চেয়ে বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাত কাটানো ঢের ভাল। পা টিপে টিপে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে ডন জোসেকে ডিঙ্গিয়ে বাইরে গেলাম। ডন জোসে তখন বিবেকবানের গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তাই তাকে না জাগিয়েই ঘর থেকে বেরনো সম্ভব হল। দরজার কাছে একটা কাঠের বড় বেঞ্চি পাতা ছিল। রাত কাটাবার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে আমি ওই বেঞ্চিতেই গা এলিয়ে দিলাম। দ্বিতীয়বার চোখ বুজতে যাচ্ছি এমন সময় একটি মানুষ ও ঘোড়ার নিঃশব্দ অপসৃয়মান ছায়া যেন দেখতে পেলাম। মনে হল আন্তোনিও। লাফিয়ে উঠলাম। এত রাতে আন্তোনিওকে বাইরে দেখে বিস্মিত হয়ে এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখে আন্তোনিও থামল। চাপা গলায় প্রশ্ন করল, সে কোথায় ?

—ঘরে ঘুমোচ্ছে। ছারপোকাকে সে পরোয়া করে না। ঘোড়াটাকে এনেছ কেন ?

এতক্ষণে আমার চোখে পড়ল আন্তোনিও ঘোড়ার খুরে সযত্নে ন্যাকড়া জড়িয়েছে। আস্তাবল থেকে বেরোবার সময় যাতে শব্দ না হয়।

আন্তোনিও আমাকে বলল, ভগবানের দোহাই ! আস্তে কথা বলুন। এই লোকটাকে আপনি জানেন না। আন্দালুশিয়ার সবচেয়ে সাংঘাতিক ডাকাত এই জোসে ন্যাভাড়ো। সারাদিন ধরে এই কথাটাই আকারে-ইঙ্গিতে আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আপনি বুঝতে চাননি।

ডাকাত হোক না হোক আমাদের কী ? সে আমাদের কিছু চুরি করেনি। চুরি করার ইচ্ছেও তার নেই, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

—ঠিক। কিন্তু ওকে ধরিয়ে দিলে দুশ দুকাত[১০] পুরস্কার পাওয়া যাবে। এখান

১০। স্পেনের প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা।

থেকে সাড়ে চার মাইল দূরে একটা সৈন্যের ফাঁড়ি আমার জানা আছে। ভোর হওয়ার আগেই আমি কয়েকজন জোয়ান নিয়ে আসব। জোসের ঘোড়াটাই নিয়ে যেতাম কিন্তু ঘোড়াটা এমনি বজ্জাত যে ন্যাভাড়ো ছাড়া আর কেউ তার কাছে ঘেঁসতে পারে না।

আমি ওকে বললাম, তুমি চুলোয় যাও। এই বেচারা তোমার কী করেছে যে তুমি ওকে ধরিয়ে দেবে? তাছাড়া, তুমি কি ঠিক জানো যে তুমি যার কথা বলছ ওই সেই লোক?

—নিশ্চয়! একটু আগে আস্তাবলে এসে সে আমাকে বলেছিল, তোর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে তুই আমাকে চিনতে পেরেছিস। আমি কে তা যদি তুই এই সদাশয় ভদ্রলো'ককে বলিস, তবে তোর মাথা গুঁড়ো করে দেব। মঁসিও, আপনি ওর পাশে থাকুন। আপনার কোনো ভয় নেই। যতক্ষণ আপনি ওর পাশে থাকবেন, ওর কোনো সন্দেহ হবে না।

কথা বলতে বলতে আমরা সরাই থেকে কিছু দূরে চলে এসেছিলাম। সেখান থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর সরাইয়ে পৌঁছয় না। আন্তোনিও ঘোড়ার খুরে জড়ানো ন্যাকড়াগুলো খুলে ফেলল। ঘোড়ায় চেপে বসবার উদ্যোগ করল। আমি অনুরোধ করে, এমন কি ধমক দিয়েও ওকে ঠেকাতে চেষ্টা করলাম।

উত্তরে ও আমাকে বলল,—আমি একটা গরিব হতভাগা। দুশ দুকাত ছেড়ে দিতে পারি না। বিশেষ করে যখন দেশকে একটা আপদমুক্ত করার প্রশ্নও রয়েছে। কিন্তু সাবধান! ন্যাভাড়ো জেগে উঠলে তার বন্দুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন সাবধান! আমি অনেকদূর এগিয়ে গেছি—আমার পক্ষে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার যা ভাল মনে হয় করুন।

শয়তানটা ঘোড়ায় চেপে দুপায়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

গাইডের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। বেশ চিন্তিতও। মুহূর্তকাল চিন্তা করলাম এবং মনস্থির করে সরাইয়ে ফিরে এলাম। ডন জোসে তখনও ঘুমোচ্ছে। নিঃসন্দেহ, বহু দুঃসাহসিক অভিযানের ক্লান্তি ও অনিদ্রার গ্লানি মুছে ফেলছে। তার ঘুম ভাঙাতে জোরে ধাক্কা দিতে হল। তার চোখের হিংস্র দৃষ্টি ও বন্দুকটা বাগিয়ে ধরবার জন্য দেহের ঝাঁকুনি আমি কখনও ভুলব না। সাবধানী হয়ে বন্দুকটা আগেই বিছানা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম।

—তাকে বললাম, মঁসিও, আপনার ঘুম ভাঙাবার জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু বোকার মত আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। হঠাৎ এখানে আধ ডজন সৈনিক এসে পড়লে কি আপনি খুশি হবেন?

সে লাফিয়ে উঠে ভীষণভাবে প্রশ্ন করল, আপনাকে কে বলেছে?

—সৎপরামর্শ হলে কোথা থেকে তা আসছে জানার দরকার কী?

—আপনার গাইড বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু ওকে এর দাম দিতে হবে। কোথায় সে?

—জানি না। আস্তাবলে। দেখছি, দেখছি। কেউ না কেউ আমাকে বলেছে।

—আপনাকে কে বলেছে? বুড়িটা নয়?

—যে বলেছে তাকে আমি চিনি না। আর এত কথার দরকার কী? আপনার কি সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করার কোনো কারণ আছে? হ্যাঁ বা না উত্তর দিন। যদি না থাকে, তবে সময় নষ্ট করবেন না। নয় তো শুভরাত্রি। আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য ক্ষমা চাইছি।

—আপনার গাইড। আপনার গাইড। গোড়াতেই আমি ওকে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু ওর হিসাব-নিকাশ পরে হবে। বিদায়, মঁসিও। আপনি আমার যে উপকার করলেন, তার জন্য ভগবান যেন আপনার মঙ্গল করেন। আপনি আমাকে যতটা জঘন্য বলে মনে করছেন, আমি ততটা জঘন্য নই। এখনও আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা যে-কোনো সহৃদয় মানুষের করুণার উদ্রেক করবে। বিদায় মঁসিও। দুঃখ রইল আপনার ঋণ শোধ করতে পারলাম না।

—ডন জোসে, আপনার যদি কোনো উপকার করে থাকি তা হলে প্রতিদানে প্রতিজ্ঞা করুন কারুর ক্ষতি করবেন না। নিন, পথের জন্য এই সিগার। শুভযাত্রা, এই বলে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। নিঃশব্দে আমার করমর্দন করে সে বন্দুক ও হ্যাভারস্যাক তুলে নিল। আমার কাছে দুর্বোধ্য একটা ভাষায় বুড়িকে কয়েকটা কথা বলে দৌড়ে আস্তাবলে চলে গেল। একটু পরে শুনলাম জোসে জোরকদমে ঘোড়া হাঁকিয়ে প্রান্তরে মিলিয়ে গেল।

আমি আবার বেঞ্চির ওপর শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আর ঘুম হল না। ভালেন্সের লোকদের মতো একসঙ্গে ভাত ও হ্যাম খেয়েছি শুধু এই কারণেই। কোনো ডাকাত, সম্ভবত কোনো খুনীকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচানো সঙ্গত কি না, নিজেকে প্রশ্ন করলাম। আইনের ধারক আমার গাইডের প্রতি কি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করলাম না? ওকে কি আমি একটা দস্যুর প্রতিহিংসার মুখে ঠেলে দিলাম না? কিন্তু আতিথেয়তার কর্তব্য? সে তো বর্বরযুগের কুসংস্কারমাত্র। মনে মনে বললাম, ভবিষ্যতে এই দস্যু যত.কুকর্ম করবে, সবকিছুর অপরাধ আমার ওপর বর্তাবে। কিন্তু একি শুধু কুসংস্কার—বিবেকের এই প্রেরণা যা সকল যুক্তিকে প্রতিহত করে? হয়তো এই অস্বস্তিকর অবস্থায় আমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। আমার কৃতকর্মের নৈতিকতা সম্পর্কে অনিশ্চিতভাবে ভাসছি, এমন সময়ভ

আন্তোনিওর সঙ্গে আধ ডজন অশ্বারোহীর আবির্ভাব হল।

আন্তোনিও বুদ্ধিমানের মতো সবাইয়ের পিছনে আসছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে ওদের বললাম যে, দু ঘণ্টা হল ডাকাতটা পালিয়েছে। ব্রিগেন্ডিয়ার বুড়িকে প্রশ্ন করায় সে বলল, 'সে ন্যাভাড়োকে চেনে কিন্তু সে একা মেয়েমানুষ।' প্রাণের দায়ে ন্যাভাড়োকে কখনও ধরিয়ে দিতে সাহস পায়নি। সে আরও বলল, ন্যাভাড়ো তার সরাইয়ে এলে মাঝরাত্তিরে উঠে চলে যাওয়াই তার রীতি। আমাকে পাসপোর্ট দেখাতে কয়েক মাইল যেতে হল। শেরিফের কাছে ঘোষণাপত্রে সই করে আমি আবার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করার অনুমতি পেলাম। আন্তেনিও আমার বিরুদ্ধে রাগ পুষে রাখল। কারণ ওর সন্দেহ আমি ওকে দুশ দুকাত থেকে বঞ্চিত করেছি। তবু কর্দোভায় আমরা বন্ধুভাবেই বিদায় নিলাম। সেখানে আমার সাধ্যমত বেশ দরাজ হাতেই ওকে পারিতোষিক দিয়েছিলাম।

॥ দুই ॥

কর্দোভায় কয়েকদিন কাটালাম। সেখানকার ডোমিনিকান গ্রন্থাগারের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে মুন্দাবিতিকা সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে শুনেছিলাম। কনভেন্টের ফাদাররা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কনভেন্টে সারাদিন কাটাতাম, সন্ধ্যায় শহরে ঘুরে বেড়াতাম। কার্দোভায় সূর্যাস্তের সময় গুয়াদালকুইভিরের দক্ষিণ পারে জেটির ওপর আলসে মানুষদের বেড়াতে দেখা যেত। সেখানে একটি ট্যানারি থেকে চামড়ার গন্ধ নাকে আসত। এই ট্যানারি চামড়া তৈরির জন্য এ দেশের প্রাচীন সুনাম আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে এখানে এমন একটি দৃশ্য দেখতে পাওয়া যেত যা সত্যি দেখবার মতো ছিল। এঞ্জেলাসের[১১] ঘণ্টা বাজার কয়েক মিনিট আগে জেটির যেদিকটা বেশ নিচু, তার প্রান্তে নদীর পারে বহু নারী জড়ো হতো। কোনো পুরুষের সাহস ছিল না এই দলের সঙ্গে মেশে। এঞ্জেলাসের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ধরে নিত সন্ধ্যা হয়েছে। ঘড়ির শেষ ঘণ্টা বাজামাত্র মেয়েরা পোশাক ছেড়ে জলে নামত। তারপর শুরু হত হৈ-চৈ, অট্টহাসি ও তুমুল হট্টগোল। জেটির ওপর থেকে মানুষেরা হাঁ-করা চোখে স্নানরতাদের গিলে খেতে চাইত। কিন্তু দেখতে পেত সামান্যই। তবুও নদীর গাঢ় নীল জলে অনির্দেশ্য সাদা দেহের রেখা কবিচিত্তকে আলোড়িত করত। একটু কল্পনার আশ্রয় নিলে অপ্সরীসহ ডায়েনা[১২] জলকেলি করছেন মনে করা কঠিন হতো না। অথচ

১১। ঈশ্বরের আবির্ভাবের স্মরণে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সূর্যাস্তের পর রোমান ক্যাথলিকদের ভজন

১২। মৃগয়াসক্তা চিরকুমারী গ্রিকদেবী

অ্যাক্টিয়নের[১৩] অবস্থা ঘটার ভয়েরও কারণ ছিল না। শুনেছি একদিনে কয়েকজন তরুণ ফুর্তিবাজ ছোকরা জুটে ক্যাথিড্রালের ঘণ্টি-অলার মুঠো ভর্তি করে দিয়ে ঠিক সময়ের বিশ মিনিট আগে এঞ্জেলাসের ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা করেছিল। যদিও তখনও দিনের আলো মিলিয়ে যায়নি, তবু গুয়াদালকুইভিবের অপ্সরীরা এতটুকু দ্বিধা করেনি। সূর্যের চেয়ে এঞ্জেলাসের ঘণ্টার ওপর ওদের আস্থা বেশি। তাই নির্বিকারচিত্তে স্নানের বেশ পরেছিল। যদিও সেটা ছিল একেবারেই নামমাত্র ব্যাপার। আমি সেদিন ছিলাম না। আমার সময়ে ছিল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের ঘণ্টি-অলা আর ম্লান গোধূলি। সে সময়ে একমাত্র বেড়ালের পক্ষেই লোলচর্ম কমলালেবুর ফেরিওয়ালা ও কর্দোভার সুন্দরীশ্রেষ্ঠা গ্রিজেতকে[১৪] আলাদা করে চেনা সম্ভব ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা চোখে কিছুই ঠাওর হচ্ছিল না। জেটির রেলিঙে হেলান দিয়ে ধূমপান করছিলাম। জেটি থেকে যে সিঁড়ি নদী পর্যন্ত নেমে গেছে, সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন একটি নারী। আমার পাশে বসলেন। ওঁর চুলে বড় একগোছা জুঁইফুল। সন্ধ্যায় জুঁইফুল থেকে মদির গন্ধ ভেসে আসছিল। পরনে সাদাসিধা কালো পোশাক। প্রায় সাধারণ পোশাকই বলা চলে—সন্ধ্যায় অধিকাংশ গ্রিজেতের যে পোশাক।

সোসাইটি লেডিরা একমাত্র সকালবেলায়ই কালো পোশাক পরেন। সন্ধ্যায় তাঁরা ফরাসিরীতি অনুযায়ী বেশবাস করে থাকেন। কাছে এসে সদ্যস্নাতা তাঁর মাথার ওড়নাটি খসিয়ে কাঁধে ফেলে দিলেন। তারার অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম ইনি যুবতী, সুন্দরীও সুগঠিতা। দীর্ঘ আয়ত চোখ। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সিগার ছুড়ে ফেলে দিলাম। সম্পূর্ণ ফরাসি এই সহবত দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন যে, তামাকের গন্ধ তাঁর বেশ লাগে। এমনকি নরম পাপোলিতো[১৫] পেলে তিনি ধূমপানও করে থাকেন। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলতে হবে, আমার সিগার কেসে কয়েকটি পাপোলিতো ছিল। তাড়াতাড়ি কেসটা এগিয়ে দিলাম। তিনি অবহেলাভরে একটি তুলে নিলেন

১৩। রাজা ক্যাডমাসের পুত্র। সাইপ্রেস ও পাইনে ঘেরা এক মনোরম উপত্যকার প্রান্তে এক গুহার ভেতরে শীতল ঝরনার জলে ডায়েনা মৃগয়ার পর ক্লান্ত দেহ জুড়াতে আসতেন। একদিন ডায়েনা অপ্সরীসহ সেখানে জলকেলি করতে এসেছেন। দেবী যখন নিরাবরণা হয়ে স্নানের প্রসাধনে রত, হঠাৎ সেখানে অ্যাক্টিয়ন এসে উপস্থিত হলেন। তিনিও সঙ্গীদের নিয়ে মৃগয়ায় এসে দলছাড়া হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। অপ্সরীরা একজন পুরুষকে দেখে চিৎকার করে ডায়েনার কাছে গিয়ে নিজেদের দেহ দিয়ে নিরাবরণা দেবীকে আবৃত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু উন্নতকায়া দেবীকে সম্পূর্ণ আবৃত করা সম্ভব হল না। বিস্ময়ে ডায়েনার মুখ হয়ে উঠল অস্তকালীন সূর্যরশ্মিরঞ্জিত মেঘের মতো। হঠাৎ জল নিয়ে অ্যাক্টিয়নের মুখে ছুড়ে দিয়ে তিনি বললেন, এখন যাও, পার তো বল গিয়ে তুমি ডায়েনাকে নিরাবরণা দেখেছ। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টিয়ন একটি হরিণে পরিণত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। বাইরে তাঁর নিজের শিকারী কুকুরেরা তাঁকে ছিঁড়ে খেলো।

১৪। বহুবল্লভা যৌবনবতী শ্রমিক রমণী। সাধারণত ধূসর রঙের পোশাক পরত বলে এদের গ্রিজেত বলা হতো।

১৫। নরম ছোট সিগার।

এক সু[১৬] বকশিশের বিনিময়ে একটি ছেলে একটা জ্বলন্ত দড়ি নিয়ে এল। দড়ির জ্বলন্ত প্রান্ত থেকে সিগার ধরালেন তিনি। তারপর সুন্দরী স্নানার্থিনী ও আমি—দুজনে সিগারের ধোঁয়া মিশিয়ে বহুক্ষণ গল্পে মশগুল হয়ে রইলাম। যখন খেয়াল হল দেখলাম জেটিতে শুধু আমরা দুজনই রয়েছি। এর পর আর তাঁকে নেভেরিয়ায়[১৭] আইসক্রিম খাওয়ার প্রস্তাব করতে কোনো সংকোচ বোধ করিনি। শালীনতাসম্মত দ্বিধার পর তিনি রাজি হলেন। কিন্তু মন স্থির করার আগে কটা বাজে জানতে চাইলেন। আমি আমার রিপিটার ঘড়িটা বাজালাম। ঘড়ির বাজনা শুনে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন।

—আপনাদের দেশের কী সব আবিষ্কার! আপনার দেশ কোথায়? আপনি ইংরেজ নিশ্চয়ই?

—ফরাসি ও আপনার দাসানুদাস। আপনার, মাদমোয়াজেল বা মাদাম? কর্দোভা নয়?

—না।

—নয়তো আন্দালুশিয়া। আপনার মিষ্টি কথা থেকে অনুমান করছি।

—মানুষের উচ্চারণ যখন আপনি এত মন দিয়ে লক্ষ্য করেন, তখন আমি কে আপনার কিন্তু বলা উচিত।

—মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে দু-পা দূরে যীশুখ্রীস্টের দেশ আপনার। আন্দালুসিয়ার এই রূপক নাম আমার সুহৃদ বিখ্যাত সেভিলীয় পিকাদর[১৮] ফ্রান্সিসকোর কাছে শুনেছি।

—বাঃ স্বর্গ! এদেশের লোকেরা বলে স্বর্গ আমাদের জন্যে নয়।

—তাহলে আপনি মোরিস্কো বা.....আমি থামলাম। ইহুদি কথাটা উচ্চারণ করার সাহস হচ্ছিল না।

—বলুন, বলুন! আপনি বেশ ভাল করেই জানেন আমি বেদেনী। আপনি আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান। কারমেনচিতার নাম শুনেছেন? আমি কারমেন।[১৯]

পনের বছর আগে এমনি নাস্তিক ছিলাম। জাদুকরীর পাশে বসে কিন্তু আমি ঘৃণায় কুঁকড়ে যাইনি। মনে মনে বললাম, মন্দ নয়। গত সপ্তাহে এক ডাকাতের

১৬। স্পেনের তাম্রমুদ্রা।

১৭। বিশেষ ধরনের আইসক্রিম কাফে। স্পেনের প্রত্যেক গ্রামে এই জাতীয় নেভেরিয়া আছে।

১৮। তোরেরো বা স্পেনের পেশাদার ষাঁড় লড়নে-অলারা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমত মাতাদর; ইনি দলে প্রধান। এর বর্শাধারী অশ্বারোহী সহযোগীদের বলা হয় পিকাদর, আর পদাতিক সহযোগীদের বান্দেরিল্লেরস্।

১৯। "মেরিমের কারমেন"নামক বইয়ে দুপোয়রা লিখেছেন: কারমেন নামটি একটি পরম আবিষ্কার। প্রাচীন ইতালিতে এই নামটি যাদুমন্ত্র, কাব্য ও সঙ্গীতের দোতনা করত। স্পেনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু কাউন্টেস, বেদেনী, ক্যাস্টিলবাসিনী ও আরও অনেকে এই নামটি বহন করেছেন। নামটি অসংখ্য নারীর দীর্ঘ চোখের মায়ায় মিশে আছে। তাই এই নাম উচ্চারিত হওয়ামাত্রই একটি মোহময় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়।

সঙ্গে নৈশভোজ হয়েছে, আর আজ এই ইবলিশের সাকরেদের সঙ্গে আইসক্রিম খাচ্ছি। বিদেশ ভ্রমণের সময় চোখ খোলা রাখা দরকার। জাদুকরীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে জাদুবিদ্যার অনুশীলনে কিছুটা সময় নষ্ট করেছিলাম। এই জাতীয় অনুসন্ধিৎসা থেকে দীর্ঘকাল মুক্তিলাভ করলেও এসব কুসংস্কারের প্রতি একটা কৌতূহল তখনও বেঁচে ছিল। বেদেদের মধ্যে জাদুবিদ্যা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তা জানার জন্যও আমি উৎসাহিত হয়েছিলাম।

গল্প করতে করতে আমরা নেভেরিয়ায় ঢুকে একটা ছোট টেবিলে বসলাম। টেবিলটা একটা কাচের চিমনি ঢাকা মোমবাতির আলোয় আলোকিত। এতক্ষণে জিতানাকে[২০] খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম। নেভেরিয়ার অন্যান্য ভদ্রলোকেরা আইসক্রিম খেতে খেতে আমাকে এমন সুসঙ্গে দেখে বিস্ময়বোধ করছিলেন।

মাদমোয়াজেল কারমেন জাত-বেদেনী কি না—আমার গভীর সন্দেহ ছিল। অন্তত বেদেদের মধ্যে এতদিন যেসব মেয়ে দেখেছি কারমেন তাদের চেয়ে বহুগুণে সুন্দরী। স্পেনীয়দের মতে কোনো মেয়েকে সুন্দরী বলে পরিচিত হতে হলে তার মধ্যে ত্রিশটি লক্ষণের মিলন হওয়া প্রয়োজন অথবা অন্যভাবে বলা চলে নারীদেহের তিনটি অংশের প্রত্যেকটিকে দশটি বিশেষণে ভূষিত করে রূপের বর্ণনা করা যায়। যেমন, নারীদেহের তিনটি কালো জিনিস —আঁখি, পক্ষ ও ভ্রূ; তিনটি সরু জিনিস—আঙুল, ঠোঁট ও চুল ইত্যাদি। অন্যান্যগুলোর জন্য ব্রাঁতোম[২১] দেখুন। আমার বেদেনী রূপের এতগুলি লক্ষণের দাবি করতে পারে না। ওর ত্বক বেশ মসৃণ হলেও তামাটে রঙের। বড় টলটলে তির্যক চোখ। সুগঠিত কিন্তু ভারী ঠোঁটের মধ্যে খোসা-ছাড়ানো বাদামের মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত। দীর্ঘ উজ্জ্বল কালো চুল। কিন্তু তাতে দাঁড়কাকের ডানার নীল রঙের প্রতিফলন। বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আপনাদের ক্লান্ত করতে চাই না। সংক্ষেপে বলা চলে প্রত্যেকটি খুঁতের সঙ্গে এমন একটা গুণ জড়িয়ে ছিল যাতে গুণটি তুলনায় অনেক বেশি ফুটে উঠত। এ এক অদ্ভুত বন্য রূপ। প্রথম দর্শনে বিমূঢ় করে দেয়, কখনও ভুলতে দেয় না। বিশেষ করে ওর চোখে একই সঙ্গে এমন লালসা ও হিংস্রতা ছিল যা এ পর্যন্ত কোনো মানুষের চোখে দেখিনি। বেদের চোখ নেকড়ের চোখ—এই স্পেনীয় প্রবাদ একান্ত সত্য। যদি চিড়িয়াখানায় গিয়ে নেকড়ের চোখ লক্ষ্য করার সময় না পান, তবে চড়াই ধরবার জন্য আপনার যে বেড়াল ওঁৎ পেতে আছে তাকে দেখুন।

কাফেতে বসে ভাগ্যগণনা করতে লজ্জা হল। তাই মোহিনী জাদুকরীর সঙ্গে

২০। স্পেনের বেদেনীকে সাধারণত জিতানা বা জিতানিল্লা বলা হয়।

২১। ষোড়শ শতাব্দীর লেখক। মেরিমে ব্রাঁতোমের Recueil des Dames বইয়ের কথা বলছেন।

ওর বাসায় যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। সে অনায়াসেই সম্মত হল। কিন্তু সে সময় জানতে চাইল। আবার আমাকে রিপিটার ঘড়িটা বাজাতে বলল।

—ওটা কি সত্যি সোনার? ঘড়িটাকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে দেখে সে বলল।

আবার যখন আমরা রওনা হলাম, তখন রাত হয়েছে। প্রায় সব দোকানপাট বন্ধ। পথ জনহীন। গুয়াদালকুইভিরের সেতু পেরিয়ে, শহরতলির প্রান্তে একটা বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়ালাম। বাড়িটি দেখে প্রাসাদ বলে ভুল করার কোনো কারণ ছিল না। একটি ছোট ছেলে দরজা খুলে দিল। আমার অজ্ঞাত এক ভাষায় বেদেনী ছেলেটিকে কয়েকটি কথা বলল। পরে জেনেছিলাম, ওই ভাষাই বেদেদের ভাষা রেমোনি বা সিপকাল্লি। আমাদের ঘরে রেখে ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল! বেশ বড় ঘর। আসবাবপত্র বলতে একটি ছোট টেবিল, দুটো টুল আর একটা পেটরা। ঘরে একটা জলের জগ, একরাশ কমলালেবু ও একগোছা পেঁয়াজ ছিল—তাও আমি ভুলিনি।

যখন ঘরে শুধু আমরা দুজন রইলাম, বেদেনী পেটরা থেকে এক প্যাকেট বহুব্যবহৃত তাস, একটা কষ্টিপাথর, একটা শুকনো কাকলাস এবং ভেলকিবাজির জন্য প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটি পদার্থ বার করল। সে কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল বলার দরকার নেই। তবে ভোজবাজির[২২] রকম দেখে বুঝলাম সে ওস্তাদ খেলোয়াড়।

কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। একটু পরেই বাধা পড়ল। হঠাৎ ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। ধূসর ওভারকোটে নাক পর্যন্ত ঢাকা একটি লোক ঘরে ঢুকল। সে বেদেনীকে যেভাবে ডাকতে লাগল তাকে ঠিক মধুর সম্ভাষণ বলা চলে না। সে কী বলছিল আমি শুনতে পাইনি, তবে তার গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম, লোকটা বিচ্ছিরি মেজাজে রয়েছে। তাকে দেখে জিতানার মুখে রাগ বা বিস্ময় কিছুই প্রকাশ পেল না। বরং সে তার কাছে ছুটে গিয়ে লোকটি যে ভাষায় এতক্ষণ কথা বলছিল, সেই ভাষায় অনর্গল কথা বলতে লাগল। একমাত্র পায়লো কথাটাই আমি বুঝতে পারলাম। এই শব্দটা বলাও হচ্ছিল বারবার। আমি জানতাম বেদেরা নিজেদের মধ্যে পরদেশীকে পায়লো বলে। মনে হল আমাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। আমি একটা অপ্রীতিকর বোঝাপড়ার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। ইতিমধ্যেই একহাতে একটা

২২। বেদেদের ভোজবাজির সম্পর্কে মেরিমের চিঠি (Correspondence Generale—tome V)। "স্পেনের বেদেরা ভোজবাজির জন্য তরবারি, কাপ, লাঠি ও স্বর্ণমুদ্রা আঁকা বড় তাস ব্যবহার করে। কফির তলানিতে ও সীসার টুকরো জলে ফেলেও ওরা অদৃষ্টের লিখন পড়ে।.......কিন্তু তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—ভোজবাজির একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে একটি চুম্বকপাথর, যাকে ওরা বলে বারলাসি বা ভাল পাথর।

টুলের পা বাগিয়ে ধরে ঠিক কোন মুহূর্তে ওটা আগন্তুকের মাথায় ছুড়ে মারতে হবে, মনে মনে আঁচ করছিলাম। আগন্তুক রূঢ়ভাবে বেদেনীকে সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। তারপর এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, মঁসিও আপনি?

এবার ওর দিকে তাকিয়ে ওকে চিনতে পারলাম—আমার বন্ধু ডন জোসে। অনুতপ্ত হলাম, কেন ওকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচিয়েছিলাম। দেঁতো হাসি হেসে বললাম, তুমি? সেই নওজোয়ান! তুমি অসময়ে মাদমোয়াজেলকে বাধা দিয়েছ। মাদমোয়াজেল এখন আমাকে অনেক মজার কথা বলতে যাচ্ছিলেন। জোসে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে কারমেনের দিকে তাকাল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, চিরকালের স্বভাব। এবার যাবে।

তবু বেদেনী ওর ভাষায় জোসেকে কীসব বলতে লাগল। ক্রমে ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওর চোখ হয়ে উঠল রক্তজবার মতো লাল। দেহের রেখা কুঁকড়ে গেল, পা ঠুকতে লাগল মাটিতে। সে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জোসেকে কিছু করতে তাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু জোসে দ্বিধা করছিল। চিবুকের নিচে ওর ছোটহাতের ক্ষিপ্রবেগে যাওয়া আসা দেখে ব্যাপারটা কী আর বুঝতে বাকি রইল না। কথাটা হচ্ছে কোনো লোকের গলা কেটে ফেলা নিয়ে, আর সেই গলাটা যে আমার, এমন সন্দেহ অমূলক বলে মনে হল না। এই বাক্যস্রোতের জবাবে জোসে কাঠখোট্রা গলায় দু-একটা কথা বলছিল মাত্র। শেষে বেদেনী জোসের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি মেলে ঘরের এক কোণে তুর্কি পদ্ধতিতে বসে পড়ল। একটা কমলালেবু বেছে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে খেতে লাগল।

দরজা খুলে ডন জোসে আমাকে হাতে ধরে বাইরে নিয়ে এল। দুজনে নিঃশব্দে দুশ পা হাঁটলাম। তারপর জোসে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল,—সোজা হেঁটে গিয়ে আপনি পুলের কাছে পৌঁছে যাবেন। জোসে তখনই পিছন ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশ মনমরা হয়ে বিশ্রী মেজাজে সরাইয়ে ফিরে এলাম। আরও খারাপ লাগল যখন জামাকাপড় ছাড়বার সময় টের পেলাম—ঘড়িটা খোয়া গেছে। নানাকথা ভেবে পরদিন সকালে ঘড়িটা উদ্ধার করার কোনো চেষ্টা করলাম না বা করেজিদরকে[২৩] ওটা খুজে বার করার কথা বললাম না। কনভেন্টে পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করে সেভিল রওনা হলাম। কয়েকমাস আন্দালুসিয়ায় ঘোরাঘুরির পর মাদ্রিদ ফিরে যাওয়ার পথে কর্দোভা যেতে হল। এখানে বেশিদিন থাকার ইচ্ছা ছিল না। কারণ এই সুন্দর শহর আর গুয়াদালকুইভিরের স্নানার্থিনীদের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। তবু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও কিছু কাজকর্মের জন্য মুর রাজাদের এই প্রাচীন রাজধানীতে কয়েকদিন থাকতেই হল।

২৩। স্পেনের শহরের শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

ডোমিনিকান কনভেন্টে যেতেই ফাদারদের একজন আমাকে দুহাত বাড়িয়ে স্বাগত জানালেন। ইনি মুন্দার অবস্থান সম্পর্কিত গবেষণায় গভীর উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তিনি বললেন ধন্য ভগবান! প্রিয় বন্ধু, স্বাগত! আপনাকেও আমরা মৃত বলে ধরে রেখেছিলাম। এই আমাকে দেখছেন—আমি আপনার আত্মার শান্তির জন্য অনেকবার পাটের নোস্টার[২৪] ও আভেমারিয়া[২৫] স্তব পাঠ করেছি। অবশ্য সেজন্য আমি দুঃখিত নই। তাহলে আপনি সত্যি সত্যি নিহত হননি। কিন্তু আমরা জানি আপনি ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন।

—কী করে? একটু বিস্মিতভাবে জবাব দিলাম।

—হ্যাঁ। আপনার সেই রিপিটার ঘড়িটার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। লাইব্রেরিতে কোরাসে যাওয়ার সময় হয়েছে কি না জানতে চাইলে আপনি ঘড়িটা বাজাতেন। ওটা পাওয়া গেছে। আপনি ফেরত পাবেন।

একটু বিব্রতভাবে বাধা দিয়ে বললাম, তার মানে আমার যে ঘড়িটা খোয়া গিয়েছিল।

তিনি বলতে লাগলেন,—বদমাসটা এখন জেলে আছে। সবাই জানে যে লোকটা এমন সাংঘাতিক যে, এক পেতেসার[২৬] জন্য সে একটা মানুষকে গুলি করে মারতে পারে। আমাদের ভয় হয়েছিল আপনাকে সে খুন করেছে। আপনাকে নিয়ে পুলিশের কাছে যাব ও আপনার চমৎকার ঘড়িটা যাতে ফেরত পান তার ব্যবস্থা করব। তারপর আর দেশে ফিরে যেন বলবেন না, স্পেনে ন্যায়বিচার নেই।

আমি বললাম, আপনাকে বলতে বাধা নেই,—ঘড়িটা হারাতেও রাজি আছি, কিন্তু কোর্টে সাক্ষী দিয়ে গরিব হতভাগাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে পারব না। বিশেষ করে যেহেতু যেহেতু....

—ওঃ আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। লোকটা দাগী আসামী, ওকে তো আর দুবার ঝোলাতে পারবে না। কিন্তু ভুল বললাম। ফাঁসির দড়িও নয়। ঘড়ি-চোরটা একজন অভিজাত।[২৭] কাল ওকে গ্যারট[২৮] করে মারা হবে। ওর আর কোনো অব্যাহতি নেই। বুঝতেই পারছেন, একটা ডাকাতি কম-বেশিতে ওর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। ভগবানকে ধন্যবাদ। ডাকাতটা ছিনিয়ে নিয়েই আপনাকে রেহাই দিয়েছে। ও অনেক খুন করেছে। প্রত্যেকটা খুনই আগের খুনের চেয়ে বীভৎস।

২৪। ঈশ্বরের কাছে প্রর্থনার প্রথম শব্দ 'পাটের নোস্টার' বা আমাদের পিতা।

২৫। মা মেরীর কাছে প্রার্থনার প্রথম শব্দ 'আভেমারিয়া' বা জয় মেরী।

২৬। স্পেনের তাম্রমুদ্রা।

২৭। অভিজাত স্পেনীয়।

২৮। শ্বাসরোধ করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান। একটি ছিদ্রযুক্ত কাঠের টুকরোর মধ্যে ঢোকানো দড়ি গলায় জড়িয়ে দেওয়া হতো। তারপর কাঠের টুকরোটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অপরাধীর শ্বাসরোধ করে মারা হত। একমাত্র অভিজাত অপরাধীকেই এভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

—কী নাম লোকটার?

—এদেশের লোক ওকে জোসে ন্যাভাড়ো বলে জানে। তবে ওর আর একটা বাস্‌ক্‌ নাম আছে। কিন্তু আমাদের দুজনের কারুর পক্ষেই তা উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না। সত্যি, ও একটা দেখবার মতো লোক বটে। আপনি এদেশের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে কৌতূহলী। বদমাসরা কীভাবে এদেশে ইহলোক ত্যাগ করে, তা জানার সুযোগ আপনার অবহেলা করা উচিত নয়। জোসে চ্যাপেলে আছে। ফাদার মার্তিনে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

আমি যাতে এই মজার ফাঁসির ব্যবস্থাটা[২৯] দেখি তার জন্য আমার ডোমিনিকান বন্ধুবর এমনভাবে জোর করতে লাগলেন যে, আমার পক্ষে আর অমত করা সম্ভব হল না। বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সঙ্গে রইল এক প্যাকেট সিগার—যাতে আমার অনধিকার প্রবেশের অপরাধ কিছুটা লঘু হয়।

জোসের সঙ্গে যখন দেখা হল, তখন ও খাচ্ছিল। আমাকে দেখে নির্জীবভাবে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল। ধন্যবাদ জানাল সিগারের জন্য। সিগারগুলো গুনে কয়েকটা বেছে নিল। ফিরিয়ে দিল বাকিগুলো। বলল, যে কয়টা ওর প্রয়োজন ও নিয়েছে। তার চেয়ে বেশি ওর দরকার হবে না। জিগ্যেস করলাম —কিছু টাকা খরচ করে আমার বন্ধুদের সাহায্যে ওর অদৃষ্টের দুঃখ একটু হালকা করার চেষ্টা করব কি না। প্রথমে বিষণ্ন হেসে ও কাঁধ ঝাঁকাল মাত্র। একটু পরে কী ভেবে আমাকে ওর আত্মার মুক্তির জন্য মাস[৩০] এর ব্যবস্থা করতে বলল। তারপর ভীরু গলায় বলল, আপনার ক্ষতি করেছে এমন কোনো মানুষের জন্য আর একটি মাস-এর ব্যবস্থা করবেন কি?

আমি বললাম, নিশ্চয় প্রিয় বন্ধু। কিন্তু আমি এদেশে এমন কাউকে জানি না, যে আমার ক্ষতি করেছে।

ও আমার হাতে গভীরভাবে চাপ দিল। মুহূর্তকাল নীরব থেকে ও আবার বলল, আপনার কাছে আর একটা অনুরোধ করব?

যখন দেশে ফিরবেন, আপনি হয়তো ন্যাভাড়ে যাবেন। অন্তত ভিত্তোরিয়া হয়ে তো যাবেনই। ন্যাভাড়ে থেকে ভিত্তোরিয়া বেশি দূরে নয়।

আমি ওকে বললাম, হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই ভিত্তোরিয়া হয়ে যাব। কিন্তু একটু

২৯। 'Petit pendement piencholi'. কথাটি মলিয়েরের Monsieur de pourceaugrac -এর তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্য থেকে গৃহীত। কথাটি আসলে petit pendement bienjoli। নাটকে সুইস সৈনিকের মুখে কথাটি বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

৩০। যীশুখ্রীস্টের শেষ নৈশভোজের স্মরণ অনুষ্ঠান। রোমান ক্যাথলিকদের বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানপূত রুটি ও মদ যীশুখ্রীস্টের মাংসে ও রক্তে পরিণত হয়।

ঘুরে পাম্পেলুন যাওয়াও আমার পক্ষে কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তোমার জন্যে আমি স্বেচ্ছায় একটু ঘুরে যাব।

—পাম্পেলুন হয়ে গেলে আপনি অনেক কিছু দেখতে পাবেন। ভারি সুন্দর শহর পাম্পেলুন। আপনাকে আমি এই মাদুলিটা দেবো (আমাকে ওর গলায় ঝোলানো মাদুলিটা দেখাল)। আপনি এটাকে কাগজে মুড়ে....উদ্গত আবেগ দমন করবার জন্য ও থামল.....এক ভালমানুষ বৃদ্ধাকে দেবেন অথবা তাঁর হাতে কাউকে দিয়ে পৌঁছে দেবেন। আপনাকে ঠিকানা বলে দিচ্ছি। আপনি বলবেন, আমার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কীভাবে হয়েছে তা বলবেন না।

কথা দিলাম ওর ইচ্ছা পূরণ করব। পরদিন সকালে আবার ওর সঙ্গে দেখা করলাম। দিনের অনেকটা সময় ওর সঙ্গে কাটল। ওর জীবনের যে দুঃখময় কাহিনী এখন বলছি, তার ওর মুখ থেকেই শোনা।

।। তিন ।।

বাজতান উপত্যকার এলিজান্দোয় আমার জন্ম। আমার নাম ডন জোসে লিজাড়াবেঙোয়া। আমার নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি বাস্‌ক্ ও প্রাচীন খ্রিস্টান। ডন[৩১] খেতাবে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। এলিজান্দোয় থাকলে পার্চমেন্টে লেখা আমার বংশতালিকা আপনাকে দেখাতে পারতাম। আমার চার্চে যোগ দেওয়ার কথা ছিল এবং উপযুক্ত শিক্ষাও পেয়েছিলাম। কিন্তু কোনো সুফল হয়নি। টেনিস খেলায় অতিরিক্ত আসক্তিই আমার কাল হল। আমরা ন্যাভাড়িরা যখন টেনিস খেলি, আমরা সব ভুলে যাই। একদিন আমি খেলায় জিতেছি। আলাভার এক ছোকরা আমার সঙ্গে গায়ে পড়ে বিবাদ বাধাল। এবার মাকিলা[৩২] নিয়ে লড়লাম। তাতেও আমার জিত হল। কিন্তু আমাকে দেশ ছাড়তে হল। একদল ড্রাগুনের[৩৩] সঙ্গে জুটে গেলাম। নাম লেখালাম আলামাঞ্জার অশ্বারোহী বাহিনীতে। আমরা পাহাড়িয়া। লড়াইয়ের কায়দাকানুন শিখতে আমাদের দেরি হয় না। অল্পদিনেই কর্পোরাল হলাম। কোয়ার্টার-মাস্টারও শীগগির হয়ে যেতাম। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। আমি সেভিলের সিগার কারখানায় রক্ষী নিযুক্ত হলাম। সেভিল গিয়ে থাকলে নগরপ্রাচীরের বাইরে গুয়াদালকুইভিরের ধারে কারখানার প্রকাণ্ড দালান দেখে থাকবেন। এখনও দালানের দরজাটা এবং পাশের রক্ষীশিবির আমার চোখে ভাসছে। দিনের কাজ শেষ হলে স্পেনীয়রা তাস খেলত অথবা ঘুমোত। আমি স্বাধীন ন্যাভাড়ি। আমি সর্বদা কোনো একটা কাজ নিয়ে থাকতাম। একদিন বন্দুক গাদাই করার শলাটা ঝুলিয়ে রাখবার জন্য তামার তার দিয়ে একটা শিকল তৈরি করছিলাম। হঠাৎ বন্ধুরা চেঁচিয়ে উঠল, এই ঘণ্টা বাজল। ছুঁড়িরা এখনই কাজে যাবে। আপনি জানেন প্রায়

৩১। অভিজাত বংশোদ্ভূত হলে ডন খেতাব দেওয়া হতো।
৩২। মাথা লোহা দিয়ে বাঁধানো লাঠি।
৩৩। জঙ্গি অশ্বারোহী বাহিনী।

চার পাঁচশ মেয়ে সিগার তৈরির কাজ করত। একটা হলঘরে ওরা সিগার পাকাত। সেখানে মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া ঢোকা যেত না। কারণ মেয়েরা, বিশেষ করে যুবতীরা গরমের দিনে বেশবাস শিথিল করে রাখত। ডিনারের পর যখন মেয়েরা কাজে ফিরত, ছোকরারা ওদের দেখবার জন্য ভিড় করত। নানারকম রঙ্গ-রসিকতাও করত। এদের মধ্যে খুব কম মেয়েই ছিল যে সিল্কের ওড়না পেলে হাত বাড়িয়ে দিত না। এমন কি এ ধরনের মাছ ধরায় যারা কাঁচা, তারাও বঁড়শি ফেলামাত্রই মাছ টোপ গিলত। অন্যেরা যখন ওদের হাঁ করে দেখত, আমি তখন দরজার পাশে আমার বেঞ্চিতে বসে থাকতাম। আমার তখন কাঁচা বয়েস। ভাবতেও পারতাম না নীল স্কার্টপরা ও কাঁধে বেণী দোলানো না থাকলে মেয়েরা কখনও সুন্দরী হতে পারে। তাছাড়া, আন্দালুশীয়দের দেখে আমার ভয় হতো। এদের মুখে শুধু বাঁকা কথা। ওরা সোজা কথার ধার ধারে না। হঠাৎ শুনলাম শহুরে নাগরেরা হাঁক দিল, দ্যাখ জিতানিল্লা। আমি চোখ তুললাম। দেখলাম কারমেন। ওকে আপনি চেনেন। কয়েকমাস আগে ওর ওখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

ওর পরনে খুব খাটো নীল স্কার্ট। পায়ে সাদা সিল্কের মোজা। তাতে অনেক ফুটো। আর আগুন-রঙা ফিতা দিয়ে বাঁধা লাল মরক্কো চামড়ার জুতো। কারমেন ওর ওড়নাটা খসিয়ে ফেলল। দেখলাম ওর কাঁধের ওপর ব্লাউজে আটকানো এক গোছা বাবলা ফুল। ঠোঁটের এক কোণে একটা বাবলা ফুল। ও মাজা দুলিয়ে হাঁটছিল। ঠিক যেন কর্দোভার আস্তাবলের একটা মাদী ঘোড়া। আমাদের দেশে এই বেশে কোনো মেয়েকে দেখলে মানুষ ক্রুশচিহ্ন দেয়। সেভিলে ওর চেহারা দেখে সবাই তারিফ করত। ও বাঁকা চোখে মাজায় হাত দিয়ে বেহায়া জাতবেদেনীর মতো জবাব দিত। প্রথমে ওকে আমার ভাল লাগেনি। আমি আবার আমার কাজে মন দিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েমানুষ ও বেড়ালের যেমন স্বভাব। ডাকলে দূরে সরে যায়, না ডাকলে কাছে আসে। কারমেন আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আন্দালুশীয়দের মতো আমায় বলল, হ্যাঁগো! তোমার শেকলটা আমায় দেবে? আমার বাক্সের চাবির গোছা রাখব। আমি উত্তর দিলাম, ওতে আমার বন্দুক গাদাই করার কাঁটাটা রাখব। কারমেন হেসে বলল, কাঁটা কী গো? ওহো, মশাই দেখছি লেস বোনেন। নয়তো কাঁটা দিয়ে মশাইয়ের কী করা হয়?

সবাই হাসতে লাগল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম, কিন্তু জবাব দেওয়ার মতো একটি কথাও খুঁজে পেলাম না। ও বলতে লাগল, বেশ, বেশ। আমার প্রাণের নাগর। আমার কলজের আগুন। ওড়নার জন্য আমাকে কালো লেস বানিয়ে দিতে হবে। তারপর ঠোঁট থেকে বাবলা ফুলটা নিয়ে বুড়ো আঙুলের টোকা দিয়ে আমার দু'চোখের মধ্যিখানে ছুড়ে মারল। মঁসিও, যেন একটা বন্দুকের গুলি এসে লাগল।

বুঝতে পারলাম না কোথায় আমার মুখ লুকোব। কাঠের পুতুলের মতো নিশ্চল হয়ে রইলাম। ও কারখানায় ঢুকে যাওয়ার পর দেখলাম আমার পায়ে বাবলা ফুলটা পড়ে আছে। আমার কী হল জানি না, সঙ্গীদের অজ্ঞাতে ফুলটা কুড়িয়ে নিলাম। সযত্নে রেখে দিলাম আমার ভেস্টের পকেটে। এই আমার প্রথম ভুল।

দু-তিন ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও আমি এই ঘটনার কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় দারোয়ান আলুথালু হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিল, কারখানার বড় হলঘরে একটা মেয়ে খুন হয়েছে। সেখানে একজন রক্ষী সৈনিক দরকার। সার্জেন্ট আমাকে দুজন লোক নিয়ে সেখানে গিয়ে কী হয়েছে দেখতে বললেন। মঁসিও, কল্পনা করুন, শুধু সেমিজ কিংবা নামমাত্র জামা পরা প্রায় তিনশ মেয়ে একসঙ্গে কেঁদে, চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুড়ে এমন তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করেছিল যে, বাজ পড়লেও শোনা যেত না। একপাশে একটা মেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। দেহ রক্তে মাখা। ছুরির দুই ঘায়ে কেউ এইমাত্র ওর মুখে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। আহত মেয়েটির বিপরীত দিকে পাঁচ-ছ'জন কারমেনকে ধরে রেখেছে। এই দঙ্গলের মধ্যে যারা একটু শিষ্ট প্রকৃতির, তারা আহতের শুশ্রূষা করছিল। আহত মেয়েটি ককিয়ে উঠল, —আমি মরতে যাচ্ছি গো। পাদ্রী ডেকে আনো। কারমেন কিছুই করছিল না। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে কাকলাসের মতো চোখ ঘোরাচ্ছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছে?

সব কটা মেয়ে একসঙ্গে কথা বলতে লাগল। কী হয়েছে জানতে বেশ বেগ পেতে হল। যা বোঝা গেল তা হচ্ছে এই—আহত মেয়েটি গর্ব করে বলেছিল ট্রিয়ানার হাটে গাধা কেনার মতো টাকা ওর ট্যাঁকে আছে। কারমেন ঠোঁটকাটা। সে জবাব দিয়েছিল — থাম, তোর একটা ঝাঁটা কেনার পয়সা আছে তো? হয়তো এ বিষয়ে মেয়েটি নিজেই নিঃসন্দেহ ছিল না। কারমেনের কথায় সে জ্বলে উঠল, সে তো আর বেদেনী বা ইবলিশের বাচ্চা নয় যে ঝাঁটার খবর রাখবে। তবে মাদমোয়াজেল কারমেনচিতা শীগগিরই তার গাধাকে দেখতে পাবে—যখন করেজিদর মশাই ওটাকে নিয়ে বেরোবেন আর পিছনে দুটো চাকর গাধার পিঠে মাছি তাড়াবে[৩৪]।

কারমেন জবাব দিল, বটে! তাহলে তোর গালে একটা মাছি বসবার জায়গা এবং সেই সঙ্গে একটা দাবার ছকও এঁকে দিই।

৩৪। মেরিমে ব্যবহৃত 'emoucher' (মাছি তাড়ানো) শব্দটি এখানে দ্ব্যর্থক। প্রধানত শব্দটি মাছি তাড়ানো বোঝালেও স্পেনে প্রচলিত বেত্রাঘাতের দ্বারা শাস্তিবিধানও বোঝায়। অপরাধীকে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরের বিভিন্ন চৌমাথায় ঘোরানো হতো। প্রত্যেক চৌমাথায় অপরাধীর নগ্ন কাঁধে চাবুক মারা হতো। এই শাস্তি বিশেষ করে ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক ও জাদুকরীর ওপর প্রযোজ্য ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সাঁই সাঁই ছুরি চলল। কারমেন সিগারের কোণকাটার ছুরি দিয়ে মেয়েটার মুখে সেন্ট আন্দ্রের ক্রুশ এঁকে দিল। ব্যাপারটা স্পষ্ট। আমি কারমেনের হাত ধরে ভদ্রভাবে বললাম, বোন, আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার দিকে একবার তাকাল কারমেন। মনে হল যেন আমাকে চিনতে পেরেছে। সমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, চল। আমার ওড়নাটা কোথায়? মাথায় এমনভাবে জড়াল যেন দুটি বড় চোখের একটিমাত্র দেখা যায়। শান্ত মেষশিশুর মতো অনুসরণ করল আমার লোক দুটিকে। রক্ষীশিবিরে আসার পর কোয়ার্টার মাস্টার বললেন, ব্যাপারটা গুরুতর। ওকে জেলে পাঠাতে হবে। বললেন, আমাকেই ওকে নিয়ে যেতে হবে।

কারমেনকে দুজন ড্রাগুনের মাঝখানে রেখে আমি পিছনে হাঁটছিলাম। এই ধরনের পরিস্থিতিতে একজন কর্পোরালের এভাবেই যাওয়া রীতি। আমরা শহরের দিকে রওনা হলাম। প্রথমদিকে বেদেনী নিঃশব্দে চলছিল। র‍্যু দ্য সেরপঁ আপনি চেনেন। রাস্তাটার নামকরণ সার্থক। কি এঁকেবেঁকেই না গিয়েছে রাস্তাটা। র‍্যু দ্য সেরপঁতে পৌঁছে কারমেন প্রথমে ওড়নাটা মাথা থেকে কাঁধে খসিয়ে ফেলল। যেন আমি ওর মোহিনী মুখ দেখতে পাই। তারপর যতটা সম্ভব আমার দিকে ঘুরে বলল, "অফিসার সাহেব গো, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

যথাসাধ্য মৃদুভাবে উত্তর দিলাম (যে কোনো খাঁটি সৈনিকের এভাবেই বন্দীর সঙ্গে কথা বলা উচিত, বিশেষত সে যদি স্ত্রীলোক হয়)—"বাছা, তোমাকে জেলে নিয়ে যাচ্ছি।"

"হায়! আমার কী হবে গো! অফিসার সাহেব গো, দয়া কর। তোমার এই কচি বয়েস! তোমার এত দয়ামায়া!" গলা নামিয়ে বলল, "আমাকে যেতে দাও। তোমাকে এক টুকরো বারলাসি দেব। দুনিয়ার সব মেয়ে তোমাকে ভালবাসবে।"

মঁসিও, বারলাসি হচ্ছে চুম্বক পাথর। বেদেরা বলে এই পাথরটা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে নানা ধরনের জাদু করা যায়। এই পাথরের একটু গুঁড়ো সাদা মদের সঙ্গে মিলিয়ে কোনো মেয়েকে খাওয়ালে তার সংযমের সব বাঁধ ভেঙে যায়।

যতটা সম্ভব গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, আমরা এখানে বাজে কথা বলতে আসিনি। তোমাকে জেলে যেতে হবে। তাই আইন। কোনো উপায় নেই।

আমরা যারা বাস্ক্—আমাদের একটা বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গি আছে, যাতে স্পেনের মানুষ অনায়াসেই আমাদের চিনে ফেলে। কিন্তু ওদের মধ্যে একজনও নেই যে শুধু আমাদের বাই জাওনা (হ্যাঁ মশাই) কথাটা বলতে পারে। আমি প্রভঁস থেকে এসেছি —এ কথাটা বুঝে নিতে কারমেনের এতটুকু দেরি হয়নি।

মঁসিও, আপনি জানেন, বেদেদের কোনো দেশ নেই। ওরা চিরদিন যাযাবর। ওরা সব ভাষা জানে। পর্তুগাল, ফ্রান্স, কাতালেনিয়া কিংবা স্পেনের প্রভঁস সব

দেশেই ওদের ঘর। এমন কি মুসলমান অথবা ইংরেজের সঙ্গেও ওরা কথাবার্তা চালাতে পারে। কারমেন বাস্‌ক্‌ ভাষা বেশ ভালই জানত।

—"লাশুনা এনে বিয়োৎসারেনা (আমার প্রাণের দরদী গো)! তুমি কি দেশ থেকে এসেছ?" ও হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল।

মঁসিও, আমাদের ভাষা এমন আশ্চর্য সুন্দর যে, ভিন্‌দেশে এই ভাষা শুনলে আমাদের দেহে কাঁপন লাগে। নিচুগলায় বলল, আমার জন্য আমার দেশের কোনো কনফেসারের যেন ব্যবস্থা করা হয়।

একটু নীরব থেকে জোসে আবার বলতে লাগল— ওকে আমাদের ভাষা বলতে শুনে আমি আবেগে উদ্বেল হয়ে বললাম, "এলিজান্দোয় আমার ঘর।"

ও বলল, "আমার এচালারে (এচালায় আমার ঘর থেকে চার ঘণ্টার পথ)—বেদেরা আমাকে সেভিলে নিয়ে আসে। কিছু টাকা জমিয়ে মার কাছে ফিরে যাব তাই কারখানায় কাজ করছি। আমার মার ভরসা বলতে তো আমি, আর কুড়িটা সাইডার গাছের একটা বাগান। হায় যে, আমার দেশের সাদা পাহাড়ের কাছে যদি ফিরে যেতে পারতাম। পচা কমলালেবুর, সওদাগর এই পকেটমারগুলো ভিন্‌দেশী বলে আমাকে অপমান করেছে। সব মাগীগুলো আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে; কারণ ওদের আমি বলেছিলাম যে ওদের দেশের সব ছুরি-অলা মরদরা মিলে আমাদের দেশের নীল টুপিপরা মাকিলাহাতে একটা জোয়ানকেও ভয় খাওয়াতে পারবে না। সাঙ্গাত, একজন দেশোয়ালির জন্য তুমি কিছু করবে না?"

মঁসিও, কারমেন মিথ্যা বলছিল, ও চিরকাল মিথ্যা বলেছে। জানি না, সারাজীবনে ও একটাও সত্যিকথা বলেছে কি না। কিন্তু ওর কথা আমি বিশ্বাস করলাম। ওর ক্ষমতা আমার চেয়ে বেশি। ও ভাঙা বাস্‌ক্‌ বলছিল। তবু আমি ওকে ন্যাভাড়ি ভাবলাম। আমি তখন পাগল হয়ে গেছি। কোনো কিছুই আর আমার নজরে পড়ল না। শুধু ভাবতে লাগলাম স্পেনীয়রা যে মুখে আমার দেশকে গাল দিয়েছে, কারমেনের মতো আমিও সে মুখ ছিঁড়ে দেব। এক কথায়, আমার অবস্থা তখন মাতালের মতো। আজেবাজে বকতে লাগলাম নির্বোধের মতো কাজ করতেও আর আমার দেরি হল না।

কারমেন বাস্‌ক্‌ ভাষায় বলতে লাগল—"দেশোয়ালি, আমি ধাক্কা দিলে তুমি যদি পড়ে যাও, তাহলে এই ক্যাস্টিলের রংরুট দুটো আমাকে রুখতে পারবে না।"

ভগবান! ওপর-অলার আদেশ ও অন্য সব কিছু ভুলে গেলাম। কারমেনকে বললাম, "দেশোয়ালি বন্ধু! তুমি চেষ্টা কর। আমাদের পাহাড়ের মা মেরী তোমার সহায় হোন।"

এ সময়ে আমরা একটা সংকীর্ণ গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেভিলে এরকম সংকীর্ণ

গলির অন্ত নেই। হঠাৎ কারমেন ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার বুকে একটা ঘুঁষি মারল। আমি ইচ্ছে করে চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। এক লাফে আমাকে ডিঙিয়ে কারমেন ছুটতে লাগল। আমরা শুধু একজোড়া ঠ্যাং দেখতে পেলাম। কথায় বলে বাস্ক্‌দের ঠ্যাঙ। ওর ঠ্যাঙের জুড়ি নেই, যেমন ক্ষিপ্রগতি, তেমনি সুডৌল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু আমার বর্শাটা আড়াআড়িভাবে রাস্তায় ফেলে রাস্তাটা আটকে দিলাম। আমার লোক দুটো তৎক্ষণাৎ ওর পিছনে ছুটতে বাধা পেল। তারপর আমিও ছুটতে লাগলাম। আমার সঙ্গীরা আমার পিছনে ছুটতে লাগল। কিন্তু কার সাধ্য ওকে ধরে? ওর ধরা পড়ার ভয়ও ছিল না। তরবারি, বর্শা ও ঘোড়সওয়ারের সাজসজ্জার বোঝা নিয়ে আমাদের সাধ্য কি ওকে ধরি! আপনাকে কথাটা বলতে যা সময় লাগল, তার চেয়েও অনেক কম সময়ে বন্দিনী অদৃশ্য হয়ে গেল। তাছাড়া মহল্লার যত জাঁহাবাজ মেয়েরা ওকে পালাতে সাহায্য করেছিল। আমাদের টিটকারি দিয়ে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছিল। এভাবে কিছুক্ষণ এলোপাথাড়ি দৌড়-ঝাঁপ করে জেলারের রসিদ ছাড়াই রক্ষীশিবিরে ফিরে যেতে হল।

আমার লোক দুটো শাস্তি এড়াবার জন্য বলল, —কারমেন আমার সঙ্গে বাস্ক্‌ ভাষায় কথা বলেছে। সত্যি বলতে কি, কারমেনের একটা মেয়েলি ঘুষিতে আমার মতো জোয়ানের চিৎপাত হয়ে পড়ে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক নয়। বরং অত্যন্ত স্পষ্টই বলা যেতে পারে। রক্ষীশিবির থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন আমার পদাবনতি ও এক মাসের কারাবাসের আদেশ হয়েছে, সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার পর এই আমার প্রথম সাজা হল। কোয়ার্টার-মাস্টারের পদের আশার শেষ।

দারুণ দুঃখে জেলের প্রথম কটা দিন কাটল। সৈনিক হয়ে আশা করেছিলাম অন্তত অফিসার হব, আমার জাতভাই লংগা, মিনা[৩৫] এখন ক্যাপ্টেন জেনারেল। সাপা লংগাড়া[৩৬] ও মিনার মতো নিগ্রো[৩৭] এবং মিনার মতোই আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছিল। সে কর্নেল হয়েছিল। ওর ভাইয়ের সঙ্গে আমি বিশবার টেনিস খেলেছি। ওটাও আমার মতো হতভাগা। নিজেকে বললাম, তুমি যে এতোদিন বিনা সাজায় কাজ করেছ, সেই সময়টাই নষ্ট হল। তুমি এখন কর্তাদের বিষ নজরে রইলে। আবার সুনজরে পড়তে হলে রংরুট হয়ে যখন এসেছিলে, তখনকার চেয়ে দশগুণ বেশি খাটতে হবে। কিন্তু কেন আমাকে শাস্তি পেতে হল? এক বজ্জাত বেদেনীর জন্য—যে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্কারা করেছে, আর এখন শহরের কোণে ফরফর

৩৫। লংগা ও মিনা দুজনেই বিখ্যাত গ্যারিলা নেতা।

৩৬। এ সাহোর Le Voyage on Navarre বইয়ে সাপা লংগাড়া নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩৭। স্পেনীয় রাজনীতির ভাষায় লিবারেলদের নিগ্রো বলা হতো।

করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তবু ওর কথা না ভেবে পারছিলাম না। মঁসিও, আপনি কি বিশ্বাস করবেন? পালিয়ে যাওয়ার সময় কারমেনের ফুটোফাটা সিল্কের মোজা স্পষ্ট দেখেছিলাম। সব সময় তা আমার চোখে ভাসছিল। জেলের গরাদের ভেতর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। রাস্তায় যে-সব মেয়েদের যাতায়াত করতে দেখতাম, তাদের একটিও এই জাত-শয়তান বেদেনীর মতো নয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবলা ফুলের গন্ধ নিতাম। সেই ছুড়ে-মারা বাবলা ফুল। শুকনো বাবলা ফুল, কিন্তু তার মধুর গন্ধ তেমনি রয়েছে। সত্যিকারের জাদুকরী যদি কেউ থাকে, তবে এই মেয়েটা তাই।

একদিন ঘরে এসে জেলার আমাকে একটি আলকালির[৩৮] রুটি দিলেন। বললেন, দ্যাখ, তোমার মাসতুতো বোন তোমাকে কী পাঠিয়েছে। রুটিটা নিলাম। কিন্তু আশ্চর্য। সেভিলে তো আমার কোনো মাসতুতো বোন নেই! হয়তো কোথাও কোনো ভুল হয়ে থাকবে। রুটিটার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম খুব সুস্বাদু এই আলকালির রুটি, লোভনীয় এর গন্ধ। ঠিক করলাম, ওটা খাব। ওটা কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, কিছুই জানার দরকার নেই। রুটিটা কাটার সময় ছুরিটা একটা শক্ত কিছুতে ঠেকল। ভাল করে দেখলাম—ভেতরে একটা ইংলন্ডে তৈরি রেতি রয়েছে। রুটি সেঁকার সময়ে ময়দার তালের মধ্যে কেউ ওটাকে ফেলে দিয়ে থাকবে। রুটির মধ্যে দুটো সোনার পিয়াস্ত্র[৩৯] ছিল। আর কোনো সন্দেহ রইল না। কারমেনের উপহার। ওদের জাতের মানুষের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে দামী আর কিছু নেই। একদিন কয়েদ এড়াতে ওরা একটা গোটা শহরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আসলে মেয়েটা ধূর্ত। কেননা এই রুটিটা দিয়ে জেলারকে কলা দেখানো চলে। এই ছোট রেতি দিয়ে সবচেয়ে মোটা সিকও এক ঘণ্টার মধ্যে কেটে ফেলা যেতে পারে। আর পিয়াস্ত্র দুটো দিয়ে প্রথমে যে পুরনো পোশাকের দোকান চোখে পড়বে, সেখানে আমার ইউনিফর্মের গ্রেটকোর্টের বদলে সাধারণ নাগরিকের পোশাক পাওয়া যেত। বুঝতেই পারছেন, যে-লোক অসংখ্যবার পাহাড়ের চূড়া থেকে ঈগলের বাসা ভেঙে নিয়ে এসেছে, তার পক্ষে ত্রিশফুটেরও কম উঁচু জানালা থেকে নিচে নেমে আসা ছেলেখেলা। কিন্তু আমি পালাতে চাইনি। সৈনিকের মর্যাদাবোধ আমি তখনও একেবারে খুইয়ে বসিনি। সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে যাওয়া অপরাধ। শুধু ওর এই স্মৃতিচিহ্ন আমার বুকটাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিল। বাইরে আমার কোনো বন্ধু আছে যে আমাকে মনে রেখেছে,—কারাবাসের সময় একথা ভাবতে বড় ভাল লাগে। তবে পিয়াস্ত্র

৩৮। সেভিল থেকে ছ'মাইল দূরে আলকালি একটি গঞ্জ। এখানে উপাদেয় ছোট রুটি তৈরি হয়।

৩৯। স্পেনীয় মুদ্রা।

দুটো একটু বেখাপ্পা ঠেকছিল। ও দুটো ফিরিয়ে দিতে পারলে স্বস্তি পেতাম। কিন্তু কোথায় পাব আমার পাওনাদারকে? ওকে খুঁজে পাওয়া সোজা কথা নয়।

এরপর আমার দুর্ভোগের শেষ হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু কপালে আরও লাঞ্ছনা ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর আমাকে সাধারণ সৈনিকের মতো পাহারার কাজে লাগানো হল। এই অবস্থায় কোনো সাহসী জওয়ানের মনের অবস্থা কী হয় কল্পনা করতে পারবেন না। এর চেয়ে গুলির মুখে দাঁড়ানো ঢের ভাল। অন্তত তখন সারা প্লাটুনের আগে মার্চ করে যাওয়া যায়। নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে হয়। সবাই তাকিয়ে দেখে।

কর্নেলের বাড়ির দরজায় আমাকে পাহারায় রাখা হয়েছিল। কর্নেলের কাঁচা বয়েস। পয়সাওয়ালা দিলদরিয়া লোক। সারাক্ষণ আমোদ ফুর্তিতে মেতে থাকত। ওর ওখানে সব ছোকরা অফিসাররা আসত। শুনেছি বহু শহুরে নাগর, এমনকি মেয়েমানুষ ও অভিনেত্রীরাও আসত। মনে হতো সারা শহরটা যেন ওর ওখানে আমাকে দেখবার জন্যই ভেঙে পড়েছে।

একদিন কর্নেলের গাড়ি এসে থামল। কোচ-বাক্সে তার খাস আর্দালি। কিন্তু গাড়ি থেকে নামল কে? জিতানিল্লা। এবারে ও একেবারে সঙ সেজে এসেছে। যেন সোনার জড়ি ও ফিতেয় মোড়া একটা গয়নার বাক্স। পোশাকে চুমকি, নীল জুতোয় চুমকি, সারাদেহ ফুল ও লেসে জড়ানো। হাতে বাস্‌ক্‌ খঞ্জনি। সঙ্গে আরও দুটো বেদেনী—একটা অল্পবয়সী, অন্যটা বুড়ি। ওদের দলের সর্দারনী হিসেবে সব সময়েই একটা বুড়ি থাকে। তাছাড়া গিটার নিয়ে একটা বুড়োও ছিল। ওটাও বেদে। বুড়োটা গিটার বাজাবে—আর ওরা নাচবে। আপনি জানেন, অনেক সময় ফুর্তি করতে ভদ্রসমাজে বেদেদের আনতে হয়। অন্য ব্যাপারেও আসে। কারমেন আমাকে চিনতে পারল। কেন জানি না, সেই মুহূর্তে আমি একশ যোজন মাটির নিচে সেঁধিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

ও বলল, আগর লাগুনা (সুপ্রভাত, দেশোয়ালি)। অফিসার সাহেব রংরুটের মতো পাহারা দিচ্ছ যে! আমি কোনো জবাব দেওয়ার আগেই ও ভেতরে ঢুকে গেল। অতিথিরা সব প্রাঙ্গণে জমা হয়েছে। ভিড় সত্ত্বেও জাফরির মধ্য দিয়ে ভেতরে যা হচ্ছিল সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। কারমেন যখন খঞ্জনি নিয়ে লাফিয়ে উঠছিল, ওর মাথাও চোখে পড়ছিল। অফিসারেরা ওকে লক্ষ্য করে যেসব কথা বলছিল, তা শুনে আমার মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। জবাবে ও কী বলেছিল জানি না। হয়তো ঠিক এই দিন থেকেই কারমেনকে মনে-প্রাণে ভালবেসেছিলাম। কারণ দু-তিনবার ইচ্ছে হয়েছিল ভেতরে গিয়ে যে রঙিলা অফিসাররা তাকে নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করছিল, তাদের পেটে আমার তরবারি ঢুকিয়ে দিই। এক ঘণ্টা ধরে এই যন্ত্রণা

ভোগ করতে হল। তারপর বেদেনীরা বেরিয়ে এল। গাড়ি করে ওরা চলে গেল। গাড়িতে ওঠার সময় কারমেন আবার ওর চোখের দৃষ্টি হানল,(আপনি দেখেছেন কারমেনের সেই চোখ)। আমাকে বলল, খাস্তাভাজা খেতে হলে ট্রিয়ানায় লিল্লাপাস্তিয়ার দোকানে যেতে হয়। মেষশিশুর মতো লঘুপদে ও গাড়িতে লাফিয়ে উঠল। কোচম্যান ঘোড়াকে চাবুক লাগাতেই এই ফুর্তিবাজ দলটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন—ডিউটির পর ট্রিয়ানায় গেলাম। কিন্তু তার আগে দাড়ি কামালাম। ব্রাশ করলাম চুল। ঠিক যেমন প্যারেডের দিন করি। কারমেন লিল্লাপাস্তিয়ার ওখানে ছিল। বুড়ো বেদে লিল্লাপাস্তিয়ার ভাজাভুজির দোকান, লোকটা মুরের মতো কালো। ওর দোকানে শহরের বহু লোক মাছভাজা খেতে আসত। আরও বেশি করে আসত কারমেন ওখানে আস্তানা নেওয়ার পর থেকে।

আমাকে দেখামাত্র কারমেন বলল, লিল্লা, আজ আর আমি কিছু করব না। যা কিছু সব কাল হবে[৪০]। চল গো দেশোয়ালি, বেড়িয়ে আসি। কারমেন মুখ পর্যন্ত ওড়না টেনে দিল। রাস্তায় চলে এলাম। তখনও জানি না কোথায় যাচ্ছি।

আমি বললাম, "মাদমোয়াজেল, জেলে আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলে, তার জন্য তোমার ধন্যবাদ পাওনা আছে। তোমার দেওয়া রুটি আমি খেয়েছি। রেতিটা আমার বর্শা ধার দেওয়ার কাজে লাগছে। ওটা তোমার স্মৃতি হিসাবে আমার কাছে রেখেছি। কিন্তু এই রহিল তোমার পিয়াস্ত্র।" কী কাণ্ড! হাসিতে ফেটে পড়ল কারমেন। "পিযাস্ত্রটা রেখে দিয়েছ? যাক্ ভালই হল। আজ আমার ট্যাঁক খালি। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। যে কুকুর রাস্তায় ঘোরে, সে ভুখা মরে না।[৪১] চল। আজ সব খেয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাক্। আর আজ খাওয়াবে তুমি।"

আমরা সেভিলের পথে চললাম। রু্য দ্য সেরপঁয় ঢোকার সময় কারমেন ডজনখানেক কমলালেবু কিনে আমার রুমালে ঢেলে দিল। আর একটু এগিয়ে কিনল রুটি, সসেজ ও একবোতল মাঞ্জালিলা[৪২]। শেষে ঢুকল এক মিঠাই-এর দোকানে। আমার দেওয়া সোনার পিয়াস্ত্র, ওর পকেটের আর একটা পিয়াস্ত্র ও আরও কিছু রুপোর মুদ্রা কাউন্টারে ছুড়ে দিল। আমার পকেটে আরও যা ছিল সব দিতে বলত। আমার পকেটে পিয়েসেত[৪৩] ও কয়েকটা কুয়ার্তো[৪৪] মাত্র ছিল। সেগুলো দিলাম। বেশি ছিল না বলে ভীষণ লজ্জিত হলাম। মনে হল ও সারা দোকানটা কিনে নিয়ে যাবে। দোকানে সবচেয়ে পছন্দসই ও দামি যা কিছু—ইয়েমা[৪৫], তুরঁ[৪৬], ফলের

৪০। বেদেদের প্রবাদ—মানানা সেরা ওত্রোদিয়া। অর্থাৎ—কালকে আবার দিন হবে।
৪১। বেদেদের প্রবাদ—সুকেল সো পিরেলা, কোকাল টেরেলা। যে কুকুর হেঁটে বেড়ায় তার হাড় জোটে।
৪২। এক জাতীয় সাদা নরম মদ।
৪৩। ও ৪৪। স্পেনীয় তাম্র মুদ্রা।
৪৫। চিনিমাখা ডিমের কুসুম।
৪৬। বাদাম-বরফি।

মিঠাই,—ওই টাকায় যা পাওয়া গেল, সব কিনে নিল। সবকিছু কাগজের থলিতে পুরে আমাকে নিতে হল। আপনি হয়তো র‍্যু দ্য কঁদিলেজো চেনেন। ওই রাস্তায় রাজা ডন পেড্রো জাস্টিসিয়ারের[৪৭] আবক্ষ প্রস্তরমূর্তি আছে। ওতেই আমার হুঁশ হওয়া উচিত ছিল। এই রাস্তায় একটা পুরনো বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়ালাম। কারমেন বাড়ির ভিতরের গলিতে ঢুকে একতলার দরজায় ঘা দিল। ইবলিশের খাস বাঁদী এক বেদেনী দরজা খুলে দিল। কারমেন রোমানিতে তাকে কী বলল। বুড়িটা প্রথম দিকে একটু গাঁইগুঁই করছিল। ওর মুখ বন্ধ করার জন্য কারমেন ওকে দুটো কমলালেবু ও একমুঠো মিঠাই দিল। একটু মদও চাখতে দিল। নিজের কোটটা চাপিয়ে দিল ওর কাঁধে। তারপর ওকে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজার কাঠের হুড়কা লাগিয়ে দিল। এবার নির্জন ঘরে শুধু আমরা দুজন। কারমেন পাগলের মতো নাচতে শুরু করল। গান গাইতে লাগল। তুমি আমার রম[৪৮] আর আমি তোমার রমি[৪৯]। আমি কেনাকাটা জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না এগুলো কোথায় রাখব। কারমেন সব কিছু মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার কাঁধে লাফিয়ে উঠল। বলল আমি তোমার ধার শুধছি। এই হল কালোদের[৫০] নিয়ম।— মঁসিও, সেদিনটা, সেদিনটা—যখন সেদিনের কথা ভাবি, কালকের

৪৭। নিষ্ঠুর নামে পরিচিত ডন পেড্রোকে তাঁর রানী 'ক্যাথলিক' ইজাবেলা জাস্টিসিয়ার ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকতেন না। খলিফা হারুণ-অল-রসিদের মতো রাজা ডন পেড্রো রাত্রিতে সেভিলের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন। কোনো এক রাত্রিতে একটি নির্জন রাস্তায় সেরেনাতে মত্ত একটি লোকের সঙ্গে রাজার বিবাদের ফলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। রাজা প্রেমিকপ্রবরকে হত্যা করেন। তরবারির ঝঞ্ঝনা শুনে এক বৃদ্ধা জানালা দিয়ে মুখ বার করেন। তার হাতের ছোট আলোয় (কঁদিলেজো) রাস্তাটি আলোকিত হয়। রাজা খুব চতুর ও শক্তিমান হলেও তাঁর দেহের গঠনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। হাঁটার সময় তাঁর হাঁটু থেকে জোরে কটকট শব্দ হতো। কটকট শব্দ শুনে বৃদ্ধার রাজাকে চিনতে একটুও বেগ পেতে হয়নি। পরদিন মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট রাজার কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন।

—মহারাজ, অমুক রাস্তায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছে। একজন মারা গেছে।

—আপনি হত্যাকারীকে চিনতে পেরেছেন ?

—হ্যাঁ, মহারাজ।

—তাহলে তাকে এখনও শাস্তি দেওয়া হয়নি কেন ?

—মহারাজ, আমি আপনার আদেশের অপেক্ষা করছি।

—আইন যা বলে আপনি তাই করুন।

রাজা ইতিপূর্বে দ্বন্দ্বযোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান করে তাদের কর্তিত মস্তক দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থানে স্থাপন করার জন্য এক আইন পাশ করেছিলেন। মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট খুব তেজস্বী পুরুষের মতো এই ব্যাপারের মীমাংসা করলেন। তিনি রাজার একটি প্রস্তরমূর্তি থেকে মাথাটা কেটে এনে দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থানে স্থাপন করলেন। রাজা ও সেভিলবাসীরা কাজটি প্রশংসনীয় বলে মনে করেছিলেন। এই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী বৃদ্ধার হাতের আলো থেকে রাস্তার নাম হল কঁদিলেজো। র‍্য দা কঁদিলেজো ও ডন পেড্রো সম্পর্কে এই হল জনশ্রুতি।

৪৮। স্বামী।

৪৯ স্ত্রী।

৫০। বেদেরা নিজেদের কালো বলে। বেদেদের ভাষায়ও কালো মানে কৃষ্ণকায়।

কথা ভুলে যাই।

দস্যু একটু নীরব থেকে সিগার ধরিয়ে আবার বলতে লাগল।—পানাহারে ও অন্য সবকিছুতে সারাদিন কাটালাম। কারমেন দুবছরের শিশুর মতো মিঠাই মুখে পুরছিল আর হাত দুটো বুড়ির জলের কুঁজোয় ডুবিয়ে বলছিল, বুড়ির জন্য শরবত বানিয়ে দিচ্ছি। ইয়েমাগুলো দেয়ালে চেপ্টে লাগিয়ে দিয়ে বলল, ওতে মাছির হাত থেকে রেহাই পাব। কোনো পাগলামি, কোনো ছলাকলা কিছুই ও বাকি রাখল না। ওকে বললাম — ওর নাচ দেখতে চাই। কিন্তু কাস্তাইনেত কোথায়? তৎক্ষণাৎ বুড়ির একমাত্র প্লেটটি টুকরো করে ভেঙে ফেলল কারমেন। চীনামাটির ভাঙা টুকরোর বাজনার সঙ্গে শুরু হল রোমালি নাচ। শুনে মনে হল যেন সত্যিকারের মেহগনি বা হাতির দাঁতের কাস্তাইনেত বাজছে। আমি হলপ করে বলতে পারি এই মেয়েটার সঙ্গ কখনও একঘেয়ে লাগবে না। সন্ধ্যা হয়ে এল। শুনতে পেলাম ড্রাম বাজছে। ওটা শিবিরে ফিরে যাওয়ার ডাক। আমি বললাম নাম ডাকার সময় হল। ব্যারাকে ফিরতে হবে।

—ব্যারাকে চল্, ঘৃণাভরে প্রতিধ্বনি করল কারমেন।

—তুমি একটা আস্ত নিগার। ভাত্তয়ে ঠাণ্ডা। আকৃতি ও প্রকৃতি দুইয়েতেই তুমি চড়ুই পাখি। ভাগো। মুরগির কলজে তোমার।

থেকে গেলাম। অদৃষ্টের হাজতবাস মেনে নিলাম আগে থেকেই।

সকালবেলা কারমেনই প্রথম বিদায় নেওয়ার কথা বলল। শোন জোসেইতো, তোমার ধার শোধ হল তো। তুমি পরদেশী। বেদেদের আইনমতো তোমার কাছে আর আমার কোনো ঋণ নেই। কিন্তু তুমি মন্দ লোক নও। তোমাকে আমার মনে ধরেছে। শোধবোধ কেমন? বিদায়।

আবার কবে দেখা হবে জানতে চাইলাম। কারমেন হাসিমুখে বলল, তোমার ক্যাবলামি যখন একটু কমবে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, বন্ধু, বুঝতে পারছ তো? তোমাকে হয়তো একটু ভালবেসে থাকব। কিন্তু তা ধোপে টিকবে না। কুকুর আর নেকড়ের ঘরকন্না বেশিদিন টেকে না। তুমি মিশরীয় আইনকানুন[৫১] মেনে চললে হয়তো আমি তোমার রমি হতাম। কিন্তু সেতো পাগলামি। তা হতে পারে না। যাক্ বাছাধন মনে রেখ—এবার খুব সস্তায় রেহাই পেলে। শয়তানের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল। হ্যাঁ, শয়তান। সে যে সবসময় দেখতে কালো হবে, তার কোনো মানে নেই মনে রেখ সে তোমার ঘাড় মটকায়নি। পশমী পোশাকে মোড়া থাকলে কী হবে! আমি মেষ নই। ফিরে গিয়ে মা মেরীর সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিও।

৫১। বেদেদের আইনকানুন। অধিকাংশ বেদের ধারণা —তাদের আদি বাসস্থান মিশর।

ওটা মা মেরীর সত্যিকারের পাওনা হয়েছে। আচ্ছা, এবার বিদায়। কারমেনচিতার কথা আর মনে এনো না। নয়তো তোমাকে কাঠের ঠ্যাঙ-অলা বিধবার[৫২] সঙ্গে বিয়ে দেবে।

এভাবে কথা বলতে বলতে ও দরজার হুড়কো খুলে দিল। রাস্তায় বেরিয়েই ওড়নায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে পেছন ফিরল।

কারমেন ঠিকই বলেছিল। ওর কথা আর মনে ঠাঁই না দিলে ভাল করতাম। কিন্তু র‍্য দ্য কঁদিলেজোর সেদিনের পর অন্য কিছুই আর ভাবতে পারছিলাম না। যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—এই আশায় প্রতিদিন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। বুড়িটা ও ভাজার দোকানির কাছে ওর খবর নিতাম। দুজনেই জবাব দিত ও লালোরায় গেছে। ওরা পর্তুগালকে ওই নামে ডাকে। সম্ভবত কারমেনের নির্দেশমতোই ওই কথা বলত। কিন্তু আমার বুঝতে দেরি হয়নি যে ওরা মিথ্যা কথা বলছে। র‍্য দ্য কঁদিলোজোয় সেদিনের পর থেকে কয়েক সপ্তাহ পরে শহরের একটা গেটে পাহারায় ছিলাম। গেট থেকে একটু দূরে প্রাচীরের গায়ে একটা ভাঙা ফোকরের মতো ছিল। দিনের বেলা সেখানে কাজ হতো। রাত্রিতে চোরাইচালানকারীদের ঠেকাবার জন্য পাহারার বন্দোবস্ত ছিল। দিনের বেলা লিল্লাপাস্তিয়াকে দেখলাম। রক্ষীবাহিনীর চারদিকে ঘুরঘুর করছে। কথাবার্তা বলছে আমার কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে। প্রত্যেকেই ওকে চিনত। ওর ভাজাভুজিকে চিনত আরও ভাল করে। লিল্লা আমার কাছে এগিয়ে এসে আজি কারমেনের খবর পেয়েছি কি না জিগ্যেস করল।

—না, আমি উত্তর দিলাম।

—তাহলে এবার খবর পাবে।

—লিল্লা মিথ্যে বলেনি। রাত্রিতে ভাঙা জায়গাটায় আমি পাহারায় ছিলাম।

কর্পোরাল চলে যেতেই একটি মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার প্রাণ বলল, ও কারমেন। তবু আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, তফাৎ যাও।

— বজ্জাতি করো না, আমাকে দেখা দিয়ে কারমেন বলল।

— কী? কারমেন তুমি?

— হ্যাঁগো দেশোয়ালি। একটা কথা আছে। এক দুয়ারো[৫৩] রোজগার করবে? থলি নিয়ে কিছু লোক এদিকে আসবে, তাদের যেতে দিও।

আমি উত্তর দিলাম — না। আমি তাদের যেতে দেব না। ওপর-অলার হুকুম আছে।

—হুকুম। হুকুম। র‍্য দ্য কঁদিলোজায় তোমার হুকুম কোথায় ছিল? শুধু স্মৃতিমাত্রই

৫২। ফাঁসিকাঠ হচ্ছে সর্বশেষে যে ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে তার বিধবা।
৫৩। স্পেনীয় রৌপ্যমুদ্রা।

উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে জবাব দিলাম — "হুকুম ভুলে যাওয়ার বিপদের যোগ্য মূল্যও পেয়েছিলাম। চোরাইচালানকারীর টাকা আমি চাই না।

—বেশ তো। টাকা চাও না? বুড়ি দরোতের ওখানে আবার ডিনারে যেতে চাও তো?"

— না, তাও চাই না। এই কয়টি কথা বলতে আমার প্রায় দমবন্ধ হয়ে এল।

বেশ। বড্ড গোলমেলে হয়েছ না? আমি জানি কোথায় আমাকে যেতে হবে। তোমার অফিসারকে আমি দরোতের ওখানে যাওয়ার নেমন্তন্ন করব। দেখে তো মনে হয় ছোকরা লোক ভাল। যে জওয়ানকে সে পাহারায় বসাবে সে শুধু যা দেখা দরকার তাই দেখবে। যাচ্ছি তাহলে, চড়ুইমশাই। ওদের হুকুমে যেদিন তুমি ফাঁসিতে লটকাবে, সেদিন আমি প্রাণ ভরে হাসব।

আমি দুর্বল। ওকে আবার ডাকলাম। কথা দিলাম দরকার মতো বেদেদের যেতে দেব। শুধু একমাত্র যে পুরস্কার আমি কামনা করি তা আমাকে দিতে হবে। কারমেন তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করল — পরদিন আমার কথা রাখবে। তারপর ছুটে গেল একটু দূরে অপেক্ষমান সাহপতদের খবর দিতে। ওরা সবশুদ্ধ পাঁচজন। তারমধ্যে একজন লিল্লাপাস্তিয়া। সবাই ইংলন্ডে তৈরি মালপত্রে বোঝাই। কারমেন নজর রাখছিল। রাউন্ডের প্রহরীদের দেখলে কাস্তাইনেত বাজিয়ে ওদের সতর্ক করে দেবে। কিন্তু প্রয়োজন হল না। ঠগের দল মুহূর্তের মধ্যে কাজ সারল।

পরদিন র‍্যু দ্য কঁদিলোজায় গেলাম। কারমেন অপেক্ষা করছিল। বিশ্রী মেজাজ নিয়ে কাছে এল। যারা মানুষকে পায়ে ধরে সাধায়, তাদের আমি দেখতে পারি না। প্রতিদানের কথা না ভেবেই প্রথমবার তুমি আমার মহা উপকার করেছিলে। গতকাল তুমি আমার সঙ্গে দরকষাকষি করেছ। জানি না, আজ আমি কেন এসেছি, কিন্তু তোমাকে আর আমি ভালবাসি না। চলে যাও তুমি। তোমার ঝামেলার জন্য এই দুয়োরোটা তুমি নিয়ে যাও।

ওর কপাল ভাল, দুয়োরোটা ওর মাথায় ছুড়ে মারিনি। প্রচণ্ড চেষ্টা করে নিজেকে সামলাতে হয়েছিল — পাছে ওর গায়ে হাত দিই। প্রায় একঘণ্টা কথা কাটাকাটির পর আমি ভীষণ রেগে বেরিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মতো শহরে এলোমেলো ঘুরে বেড়ালাম। শেষে একটা গির্জার অন্ধকারতম কোণে বসে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলাম।

হঠাৎ কার গলা কানে এল: ড্রাগুনের চোখের জল। এ দিয়ে আমি প্রেমের আরক বানাব। চোখ তুলে দেখলাম, কারমেন। ও আমাকে বলল, আচ্ছা দেশোয়ালি, তুমি কি এখনও আমাকে চাও? যাই বলি না কেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি চলে আসার পর আমার কী হয় জানি না। বেশ, এবার আমি তোমায় ডাকতে

এসেছি। র‍্যু দ্য কঁদিলোজায় যাবে তো?

আবার আমাদের মধ্যে সব মিটমাট হয়ে গেল। কিন্তু কারমেনের মেজাজ আমাদের দেশের আবহাওয়ার মতো। আমাদের পাহাড়ে সূর্যের আলো যখন ঝলমল করছে, তখন বুঝতে হবে ঝড়ের আর দেরি নেই। কারমেন কথা দিয়েছিল, আর একবার দরোতের ওখানে সে আমার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু ও আসেনি। দরোতে আমাকে অবলীলাক্রমে বলল, মিশরীয় ব্যাপারে কারমেন লালোরায় গেছে। পুরনো অভিজ্ঞতার ফলে কোথায় কারমেনের খোঁজ করতে হবে জানতাম। দিনে বিশবার র‍্যু দ্য কঁদিলোজায় ঘোরাঘুরি করতাম। একদিন সন্ধ্যায় দরোতের ওখানে ছিলাম, দরোতেকে মাঝে মাঝে গ্লাসে কয়েক অ্যানিজেত[৫৪] খাইয়ে বেশ বশ করে এনেছিলাম। এমন সময় কারমেন ঘরে ঢুকল। পেছনে আমাদের রেজিমেন্টের এক ছোকরা লেফ্‌টেনান্ট।

কারমেন বাস্‌ক্‌ভাষায় আমাকে বলল—এখনি এখান থেকে চলে যাও। আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাগে আমার রক্ত টগবগ করতে লাগল। লেফ্‌টেনান্ট আমাকে বলল — তুই এখানে কী করছিস? ভাগো হিঁয়াসে।

আমি নড়তে পারলাম না। দেহ যেন পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেল। মাথা থেকে টুপি পর্যন্ত খুলিনি দেখে আফিসারটি রেগে আমার কলার ধরে ঝাঁকুনি দিল। ওকে আমি কী বলেছিলাম জানি না। অফিসারটি তরবারি বার করল। আমিও খাপ থেকে তরবারি খুলে ফেললাম। বুড়িটা আমার হাত ধরে ফেলল। অফিসারটি তরবারি দিয়ে আঘাত করল আমার কপালে। তার চিহ্ন এখনও আমার কপালে রয়েছে। আমি হটে গিয়ে কনুই-এর গুঁতো দিয়ে বুড়িকে মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর লেফটেনান্ট যখন আমাকে তাড়া করছিল, তখন আমি তরবারিটা বাড়িয়ে দিলাম। সে আমার তরবারিতে এফোঁড় - ওফোঁড় হয়ে গেল। কারমেন আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ওদের ভাষায় দরোতেকে পালাতে বলল। আমি ওখান থেকে পালিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলাম—জানি না কোথায়। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে অনুসরণ করছে। যখন সম্বিৎ ফিরে এল, দেখলাম কারমেন আমার সঙ্গ ছাড়েনি।

কারমেন বলল—হাঁদারাম। ক্যাবলামি ছাড়া আর কিছু শেখনি। বলিনি আমি তোমার জন্যে দুর্ভাগ্য নিয়ে আসব? কিন্তু কিছু ভেব না। তোমার যখন বেদে সাঙ্গাতনী জুটেছে, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আগে এই রুমালটা মাথায় জড়িয়ে তোমার বেল্টটা আমায় খুলে দাও। এই গলিতে আমার জন্যে একটু দাঁড়াও। আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি,—বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই একটা ডোরাকাটা ওভারকোট নিয়ে এল। জানি না ওটা ও কোথা থেকে জোটাল। কারমেন আমার ইউনিফর্ম

৫৪। মৌরীমশলায় তৈরী একজাতীয় পানীয়।

খুলে নিয়ে সার্টের ওপর ওভারকোটটা চাপিয়ে দিল। রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল কপালের ক্ষত। মাথায় রুমাল জড়ানো অবস্থায় আমাকে দেখাচ্ছিল — ভ্যালেন্সের যে সব চাষীরা সেভিলে গুফসে রস বেচতে আসে, ঠিক তাদের মতো। একটা ছোট গলির শেষ প্রান্তে প্রায় দরোতের বসার মতো একটি বাসায় কারমেন আমাকে নিয়ে এল। সেখানে কারমেন ও আর একটা বেদেনী আমার ক্ষত ধুয়ে যে কোনো সার্জেন্ট মেজরের চেয়ে নিপুণ হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। আর দিল পানীয়। জানি না কি ধরনের পানীয় ওটা। শেষে একটা গদির ওপর আমাকে শুইয়ে দিল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সম্ভবত পানীয়ের সঙ্গে ওরা ওদের বিশেষ ধরনের ঘুমের ওষুধ (যার মর্ম শুধু ওদেরই জানা আছে) মিশিয়ে দিয়েছিল। কারণ পর দিন অনেক বেলায় আমার ঘুম ভাঙল। আমার গায়ে তখনও জ্বর, মাথায় সাংঘাতিক ব্যথা। গত সন্ধ্যায় যে ভয়ানক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, সে সব কথা মনে হতে বেশ কিছু সময় লাগল। আমার ক্ষত বেঁধে দিয়ে কারমেন ও তার সঙ্গিনী উবু হয়ে আমার বিছানার পাশে বসেছিল। ওরা সিপকাল্লিতে[৫৫] কী বলাবলি করল। দুজনেই আশ্বাস দিল—আমি দুদিনেই সেরে উঠব। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেভিল ছেড়ে যেতে হবে। কেননা, ধরা পড়লে আমাকে গুলি করে মারা হবে। কিছুতেই রেহাই নেই।

কারমেন আমাকে বলল, — যাদুমণি, তোমাকে একটা কিছু করে খেতে হবে তো? এখন তো সরকার তোমার জন্য ভাত আর শুঁটকি মাছ জোগাবে না। এবার তোমাকে অন্য কোনো আয়ের পথ দেখতে হবে। চালাকের মতো চুরি করার বুদ্ধিটুকুও তোমার নেই। কিন্তু তুমি চটপটে ও শক্তিমান। বুকের পাটা থাকে তো পাহাড়ে গিয়ে চোরাইচালানকারী হয়ে যাও। বলিনি, — তোমাকে আমি ফাঁসির দড়িতে ঝোলাব। গুলি খেয়ে মরার চেয়ে তা ঢের ভাল। তাছাড়া, ঠিকভাবে চলতে পারলে রাজার হালে থাকবে। অন্তত যতদিন সৈনিক বা উপকূলরক্ষীদের হাতে ধরা না পড়।

কী লোভনীয় করেই না শয়তানী আমার নয়াজীবনের পথ বাতলে দিল। সত্যি কথা বলতে কি, এই একমাত্র পথই আমার জন্য খোলা ছিল। কারণ আমার মাথার ওপর তখন খড়্গ ঝুলছে। সত্যি বলব মঁসিও? আমাকে রাজি করাতে ওর বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। ভেবেছিলাম ঝড়ের মতো উত্তাল বিদ্রোহীর জীবন মেনে নিলে কারমেনকে আরও নিবিড়ভাবে পাব। নিজেকে আশ্বাস দিলাম — এখন থেকে কারমেনের ভালবাসা পাব। আন্দালুশিয়ার কয়েকজন চোরাইচালাকারীর কথা অনেক

৫৫। বেদেদের ভাষার নাম রোমেনি বা সিপকাল্লি।

শুনেছিলাম। তারা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সারা আন্দালুশিয়া ঘুরে বেড়ায়। তাদের হাতে বন্দুক—ঘোড়ার পিছনদিকে তাদের প্রণয়িনী। আমার মধুর বেদেনীকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে পাহাড় উপত্যকা পেরিয়ে যাচ্ছি, ইতিমধ্যেই এই ছবি আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। কারমেনকে তা বললাম। সে হাসিতে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল। আমাকে বলল, রাত্তিরে তাঁবুতে রাত কাটানোর চেয়ে মধুর আর কিছু নেই। ছোট তাঁবু—তিনদিক কাপড় দিয়ে বৃত্তাকার করে ঘেরা, ওপরে একটা কম্বল চাপানো। প্রত্যেক রম তার রমিকে নিয়ে এই তাঁবুতে রাত কাটায়। আমি ওকে বললাম, যদি কখনও পাহাড়ে যেতেই হয়, তাহলে তোমার ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিন্ত হতে হবে। সেখানে ভাগীদার কোনো লেফটেনান্টের থাকা চলবে না।

কারমেন উত্তর দিল — হিংসুটে কোথাকার। জ্বলে-পুড়ে মরছে। আচ্ছা বোকা তো! তোমাকে ভালবাসি, তা কি দেখতে পাও না? কখনও তোমার কাছে একটি পয়সা চেয়েছি?

যখন ও এভাবে কথা বলত, ইচ্ছা হতো ওকে গলা টিপে মেরে ফেলি। সংক্ষেপে বলছি। কারমেন আমাকে সাধারণ নাগরিকের পোশাক যোগাড় করে দিল। সেই পোশাকে সকলের আজ্ঞাতে সেভিল ত্যাগ করলাম। পাস্তিয়ার চিঠি নিয়ে জেরেজে এক প্যানিজেতের ব্যবসায়ীর কাছে গেলাম। তার ওখানে চোরাই চালানকারীরা জমায়েত হতো। এই লোকগুলোর সাঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তাদের সর্দার দাঁকাইর আমাকে দলে ভর্তি করে নিল। গঁছ্যায় রওনা হলাম। সেখানে কারমেন আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল। আবার কারমেনকে কাছে পেলাম। অভিযানের সময় কারমেন গুপ্তচর হিসাবে কাজ করত। গুপ্তচর হিসাবে ওর কোনো জুড়ি ছিল না। ও জিব্রাল্টার থেকে ঘুরে এল। ইংলন্ড থেকে যে মাল আসবার কথা ছিল, ও ইতিমধ্যেই এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তা নামাবার বন্দোবস্ত করে ফেলল। এই মালের জন্যে আমরা এস্তেপোনার কাছাকাছি গেলাম। মালের কিছুটা পাহাড়ে লুকিয়ে রাখলাম। বাকি মাল নিয়ে আমরা রঁদায় ফিরে এলাম। আমাদের আগেই কারমেন সেখানে হাজির হয়েছিল। শহরে ঢোকার সময়টাও কারমেনই বলে দিল। এই প্রথম অভিযান ও পরপর আরও কয়েকটি সফল হয়েছিল। সৈনিকের চেয়েও চোরাইচালানকারীর জীবন ভাল লাগল আমার। কারমেনকে নানা উপহার দিলাম। টাকা ও প্রেমিকা — দুই-ই আমার মিলল। প্রায় কোনো অনুশোচনাই আমার ছিল না বলা চলে। বেদেদের প্রবাদ আছে আরামের চুলকুনি চুলকুনিই নয়[৫৬]। যেখানে যেতাম, বেশ সমাদর পেতাম। সঙ্গীরা আমার সঙ্গে বেশ ভাল

৫৬। সারাপিয়া সং পেসকিতাল, লে পুজভা।

ব্যবহার করত। বেশ খাতির করত বলা চলে। তার কারণ আমি একজন মানুষ খুন করেছি। অবশ্য ওদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে বুক ফুলিয়ে ওই ধরনের কীর্তির কথা বলতে পারত না। কিন্তু আমার নতুন জীবনে আমাকে যা সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল তা হচ্ছে এই : কারমেনের দেখা প্রায়ই পেতাম। ও আমাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রীতির চোখে দেখত। কিন্তু সঙ্গীদের সামনে ও আমার প্রণয়িনী একথা প্রকাশ করত না। এমন কি এ বিষয়ে আমিও কিছু বলব না — আমাকে নানাভাবে শপথ করিয়ে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়ে নিয়েছিল। এই জীবটির কাছে আমি এমনই দুর্বল ছিলাম যে, ওর সব খামখেয়াল মেনে নিতাম। তাছাড়া, এই প্রথম ও গেরস্তঘরের বউয়ের মতো সংযত আচরণ করছিল। আমিও সাদামনে ভেবেছিলাম, ওর আগেকার চালচলন সত্যিই শুধরেছে।

আট-দশজন লোক নিয়ে আমাদের দল। একমাত্র জরুরি প্রয়োজনেই আমরা একত্র হতাম। অন্য সময় দু'জন-দু'জন কিংবা তিনজন-তিনজন করে আমার শহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে থাকতাম। প্রত্যেকেই একটা-না-একটা কাজ করত। কেউ ঝালাইকর, কেউ ঘোড়ার দালাল, কেউ বা ছিট কাপড়ের ফেরিওয়ালা। সেভিলের কুকীর্তির জন্য আমি কদাচিৎ শহরে বের হতাম। একদিন, একদিন রাত্তিরে বলা যেতে পারে, — ভেজেরের পাদদেশ আমাদের জমায়েত হয়েছিল। সবারই আগে আমি ও দঁকাইর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেখলাম, দঁকাইর খোশমেজাজে রয়েছে। সে বলল, আমরা আরও একজন সঙ্গীকে ফিরে পাব। কারমেন তার সেরা খেল দেখিয়েছে। ওর রম তারিকার জেলে ছিল। কারমেন এইমাত্র তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। বেদেদের ভাষা আমি কেবল বুঝতে শুরু করেছিলাম। আমার সব সঙ্গীরাই এই ভাষা বলত। রম শব্দটি আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল।

সর্দারকে বললাম, কী বললে? কারমেনের স্বামী? ওর তাহলে বিয়ে হয়েছে? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। ও বিয়ে করেছে ওরই মতো ধূর্ত কানা গার্সিয়াকে। বেচারার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। জেলে ডাক্তারকে পাঠিয়ে কারমেন ওর রমকে ছাড়িয়ে এনেছে। সত্যি, এই ছুঁড়িটার দাম ওর ওজনের সোনার সমান। দুবছর ধরে কারমেন ওকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করছিল কিন্তু অফিসার বদলি না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। নতুন অফিসার যাতে ওর কথায় কান না দেয় তার ব্যবস্থা করতে ওর বেশি দেরি হয়নি।

বুঝতেই পারছেন, এই খবরে আমার কি আনন্দ হল। কানা গার্সিয়ার দেখা পেতেও দেরি হল না। এতবড় হিংস্র পশু বেদেদের মধ্যেও আর হয়নি। গায়ের রঙ কালো। তার চেয়েও কালো ওর ভেতরটা। সারা জীবনে আমি এমন নচ্ছার বদমাইশ দেখিনি। কারমেন ওর সঙ্গে এল। ও যখন গার্সিয়াকে রম বলে ডাকত

তখন ও যে চোখে আমার দিকে তাকাত, আর পিছন থেকে গার্সিয়াকে যেভাবে ভেংচি কাটত তা দেখবার মতো ছিল। আমার ভীষণ রাগ হল। রাত্রিতে ওর সঙ্গে কথা বললাম না। সকালবেলা ঝোলাঝুলি বেঁধে রওনা হতেই দেখি পিছনে ডজনখানেক ঘোড়সওয়ার আমাদের তাড়া করেছে। দলের যে-সব আন্দালুশীয় বাহাদুররা খুনখারাপি ছাড়া কথাই বলত না, তাদের মুখ এখন শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। তারা চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে পালাতে লাগল।

শুধু দঁকাইর, গার্সিয়া ও এদজার সাহসী রমঁদাদো ও কারমেন মাথা ঠিক রাখল। অন্য সবাই ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে খাদে লাফিয়ে পড়ল। ঘোড়সওয়াররা সেখানে যেতে পারবে না। আমাদের ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিতে হল। চটপট মালপত্রের মধ্যে শুধু দামি জিনিসগুলো বেছে নিলাম। সেগুলো ঘাড়ে ফেলে পাহাড়ের সবচেয়ে খাড়া ঢাল বেয়ে পালাতে লাগলাম। থলিগুলো আগে ঢাল দিয়ে গড়িয়ে দিয়ে আমরা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে পিছনে নামতে লাগলাম। সারা সময়টা শত্রুরা গুলি ছুড়ছিল। এই প্রথম কান ঘেঁষে শনশন করে গুলি যেতে শুনলাম। কিন্তু তাতে এমন কিছু মনে হয়নি। কোনো মেয়ের চোখের সামনে মৃত্যুকে তুচ্ছ করার বাহাদুরিই বা কী আছে? আমরা সবাই পালাতে পারলাম, কিন্তু শুধু হতভাগা রমঁদাদো পড়ে রইল। ওর মূত্রাশয়ে গুলি লাগল। আমি থলি ফেলে দিয়ে ওকে তুলে নিতে চেষ্টা করলাম। গার্সিয়া চেঁচিয়ে উঠল, গাধা কোথাকার। এই মরাটা দিয়ে আমাদের কী হবে? ওকে শেষ করে দে। ওর মোজাটা খুলে নিতে ভুলিস না। ওকে ফেলে দে, কারমেন চিৎকার করল।

ক্লান্ত হয়ে মুহূর্তের জন্যে ওকে একটা পাহাড়ের আড়ালে নামিয়ে দিলাম। গার্সিয়া এগিয়ে এসে ওর মাথায় বন্দুকটা খালি করে দিল। এখন যে ওকে চিনতে পারবে তার বুদ্ধি আছে বলতে হবে,—এক ডজন গুলিতে ছিন্নভিন্ন রমঁদাদোর মুখের দিকে তাকিয়ে গার্সিয়া বলল।

দেখুন, কী আনন্দের জীবন বেছে নিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে একটা ঝোপে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সঙ্গে একদানা খাবার নেই। আরও সর্বনাশ হয়েছিল ঘোড়াগুলো হারিয়ে। অথচ পিশাচ গার্সিয়া কী করছিল শুনবেন? পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বার করে আগুনের আলোয় দঁকাইয়ের সঙ্গে সে তাস খেলতে লাগল। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে তারার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম রমঁদাদোর কথা। ভাবছিলাম ঢের ভাল ছিল যদি রমঁদাদোর জায়গায় আমি শুয়ে থাকতাম। কারমেন আমার পাশে জড়সড় হয়ে বসে ছিল। মাঝেমাঝে কাস্তাইনেত বাজিয়ে গুন্‌গুন্ করছিল। হঠাৎ ও আমার ওপর ঝুঁকে পড়ল যেন আমার কানে কানে কিছু বলবে। চুমু খেল আমাকে দু-তিনবার। আমার বাধা সত্ত্বেও। আমি বললাম,

তুমি শয়তান।

হ্যাঁ, তাই — কারমেন উত্তর দিল। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর ও গঁছ্যায় চলে গেল। পরদিন সকাল বেলা একটি রাখাল ছেলে আমাদের জন্যে রুটি নিয়ে এল। দিনের বেলাটা আমরা সেখানেই কাটিয়ে দিলাম। রাত্রিতে গঁছ্যার দিকে এগোলাম। আশা ছিল কারমেনের কাছ থেকে খবর আসবে। কিন্তু কোনো খবর এল না। দিনের বেলা দেখলাম একটা খচ্চরচালক একজন সুসজ্জিত মহিলাকে নিয়ে আসছে। মহিলার হাতে রঙিন ছাতা। সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে, সম্ভবত পরিচারিকা। গার্সিয়া বলল, দ্যাখ, সেন্ট নিকোলাস দুটো মেয়ে ও দুটো খচ্চর পাঠিয়েছেন। চারটে খচ্চর হলে আরও ভাল হতো। যা হোক, এতেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

গার্সিয়া বন্দুক নিয়ে রাস্তার দিকে নেমে গেল। দঁকাইর ও আমি একটু দূরে থেকে ঝোপের আড়াল দিয়ে ওর পিছন পিছন যেতে লাগলাম। যখন ওদের বন্দুকের গুলির আওতার মধ্যে পেলাম, আমরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খচ্চর চালককে হাঁক দিলাম। থামতে বললাম। মহিলাটি কিন্তু আমাদের দেখে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা (আমাদের সাজগোজ দেখে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল), হেসে লুটিয়ে পড়ল। লিল্লিপেঙ্গি, গাধার দল, আমাকে ভদ্রলোকের মেয়ে ঠাউরেছে। কারমেন কিন্তু ছদ্মবেশ এমনই নিখুঁত যে অন্য ভাষায় কথা বললে আমি ওকে চিনতেই পারতাম না। কারমেন ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে দঁকাইর ও গার্সিয়ার সঙ্গে ফিসফিস করে কী বলাবলি করল। আমাকে বলল, — চড়াই, তুমি ফাঁসিতে লটকাবার আগে আবার দেখা হবে। মিশরের ব্যাপারে আমি জিব্রাল্টার যাচ্ছি। কিছুদিনের মধ্যেই আমার খবর পাবে। কয়েকদিন থাকবার মতো একটা ডেরা দেখিয়ে দিয়ে কারমেন চলে গেল। এই মেয়েটা আমাদের দলের ভাগ্যবিধাতা। অল্পদিনের মধ্যে কিছু টাকাও পাঠাল কারমেন। আর পাঠাল খবর, যার দাম টাকার চেয়ে বেশি। দুজন ইংরেজ মি-লর্ড অমুক রাস্তা দিয়ে জিব্রাল্টার থেকে গ্রেনাডা যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে ছিল ঝকঝকে গিনি। গার্সিয়া ওদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমি দঁকাইর আপত্তি করলাম। আমরা শুধু ওদের টাকা, ঘড়ি ও সার্ট কেড়ে নিলাম। সার্টগুলোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমাদের।

মঁসিও, কিছু না ভেবেচিন্তে মানুষ ডাকাত হয়ে যায়। কোনো সুন্দরীকে দেখে হয়তো মাথা ঘুরে গেল, খুনখারাপি হল ওকে নিয়ে, হানা দিল দুর্ভাগ্য। পাহাড়ে চোরাই চালানকারীদের সঙ্গে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। কিছু তলিয়ে দেখার আগেই সে ডাকাত হয়ে গেল। মি-লর্ডদের ঘটনার পর জিব্রাল্টারের কাছাকাছি থাকা আর নিরাপদ মনে হল না। আমরা রঁদার পর্বতমালায় লুকিয়ে রইলাম। আপনি আমাকে জোসেমারিয়ার কথা বলেছিলেন। এখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

অভিযানের সময় জোসেমারিয়া ওর প্রণয়িনীকে সঙ্গে নিত। বেশ সুন্দরী, নম্র ও বুদ্ধিমতী মেয়েটি। চমৎকার আচার-ব্যবহার, একটিও অসঙ্গত কথা ওর মুখ দিয়ে বেরোত না। আর কী ভক্তি! প্রতিদানে জোসেমারিয়া ওকে ভীষণ দুঃখ দিত। সারাক্ষণ অন্য মেয়ের পিছনে ঘুরে বেড়াত। যন্ত্রণা দিত ওকে। মাঝে মাঝে আবার ঈর্ষাপীড়িত নাগরের ভূমিকাও নিত। একবার সে মেয়েটির ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল। তাতে কিন্তু মেয়েটির ভালবাসা আরও বেড়ে গিয়েছিল। এমনি ধাতুতে মেয়েরা গড়া, বিশেষ করে আন্দালুশিয়ার মতো মেয়েরা। মেয়েটি ওর বাহুর কাটা দাগটা গর্বভরে দেখাত, যেন দুনিয়ায় এরচেয়ে সুন্দর জিনিস আর কিছু নেই। তার ওপর, জোসেমারিয়া সঙ্গী হিসাবে ছিল অত্যন্ত কদর্য। একবার একটা অভিযানে একসঙ্গে গিয়েছিলাম। সে এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল যে, সব লাভের ভাগী হল সে, আর মার জুটল আমাদের অদৃষ্টে। কিন্তু যা বলছিলাম—কারমেনের কোনো খবর পাচ্ছিলাম না। দঁকাইর বলল, আমাদের মধ্যে কাউকে ওর খবরের জন্যে জিব্রাল্টার যেতে হবে। কারমেন এতদিনে কিছু একটা ব্যবস্থা করেছে নিশ্চয়। আমি যেতে রাজি হলাম। কিন্তু সেখানে আমাকে সবাই চেনে।

কানাটা বলল, আমাকেও সবাই চেনে। গলদাচিংড়িগুলোকে[৫৭] নিয়ে তো কম কীর্তি করিনি! তাছাড়া, একচোখ নিয়ে আমার পক্ষে ছদ্মবেশ নেওয়াও মুস্কিল।

তবু আমাকে যেতেই হয়। কারমেনকে আবার দেখতে পাওয়ার কল্পনায় আবিষ্ট হয়ে বললাম—আচ্ছা, তাহলে কী করতে হবে?

ওরা বলল, জাহাজে অথবা সেন্টরক হয়ে—যেভাবে তুমি ভাল মনে কর—যেতে পার। জিব্রাল্টার বন্দরে চকোলেট ব্যবসায়ী লা রোল্লোনা কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করবে। ওকে খুঁজে পেলে ওখানে কী হচ্ছে জানতে পারবে।

স্থির হল—আমরা তিনজনই রঁদার পর্বতমালার দিকে রওনা হব। সেখানে আমার সঙ্গী দুজন যাবে। আমি ফলের ফেরিওয়ালা সেজে জিব্রাল্টার যাব। রঁদায় আমাদের দলের একটা লোক আমাকে পাসপোর্ট যোগাড় করে দিল। গঁদ্যায় একটা গাধা জুটিয়ে দিল। গাধার পিঠে কমলালেবু ও তরমুজ চাপিয়ে রওনা হলাম। জিব্রাল্টার পৌঁছে দেখলাম লা রোল্লোনাকে সবাই চেনে। কিন্তু হয় সে মারা গেছে, নয় তো শয়তানের খপ্পরে পড়েছে। সে নিখোঁজ হওয়াতেই কারমেনের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। গাধাটাকে একটা আস্তাবলে রেখে কমলালেবুর ফেরিওয়ালা সেজে শহরে বেরোলাম। আমার আসল উদ্দেশ্য যদি কোনো চেনামুখ চোখে পড়ে যায়। নানাদেশের সব ভবঘুরে জিব্রাল্টারে জড়ো হয়েছে। জায়গাটাকে হট্টমালার

৫৭। লালরঙা ইউনিফর্মের জন্য ইংরেজরা স্পেনে এই নামে পরিচিত।

দেশ বলা যায়। কারণ কোনো রাস্তায় দশ পা এগোলে অন্তত দশটা ভাষা কানে আসবে। অনেক বেদের দেখা পেলাম, কিন্তু ওদের বিশ্বাস করতে ভরসা হল না। ওরা আমাকে বাজিয়ে দেখতে চাইল, আমিও ওদের বাজিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। এভাবে দুদিন হাঁটাহাটি করেও রোল্লোনা বা কারমেনের কোনো হদিস পেলাম না। ঠিক করলাম কিছু কেনাকাটা করে আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাব। সূর্যাস্তের পর একদিন রাস্তায় ঘুরছিলাম। একটা জানালা থেকে মেয়েলি গলার ডাক শুনলাম—ও লেবুওয়ালা! মাথা তুলে দেখলাম—কারমেন। একটা ঝোলানো বারান্দায় লাল পোশাক পরা এক ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসারের কাঁধে সোনার ব্যান্ড, কোঁকড়া চুল—চেহারা দেখে মনে হয় একজন শাঁসালো ইংরেজ মি-লর্ড। কারমেনের বেশবাস অপূর্ব সুন্দর। কাঁধে শাল, মাথায় সোনার চিরুনি; সারাদেহ সিল্কে জড়ানো। তবু তেমনই ধূর্ত শয়তানের প্রতিমূর্তি। কারমেন হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। ইংরেজটি আমাকে ভাঙা স্পেনিসে ওপরে যেতে বলল। মাদাম লেবু চাইছেন।

কারমেন আমাকে বাস্‌কে বলল, উঠে এস। কোনো কিছুতেই আশ্চর্য হয়ো না। সত্যি, ওর কোনো কাজে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ওকে ফিরে পেয়ে উল্লসিত কি ক্ষুব্ধ হলাম, জানি না। দরজায় পাউডার মাখা দীর্ঘদেহ ইংরেজ পরিচারক। সে আমাকে সুসজ্জিত ড্রইংরুমে নিয়ে এল। কারমেন তৎক্ষণাৎ বাস্‌কে বলল, মনে রেখো, তুমি একটি স্প্যানিশ শব্দও জান না। তুমি আমাকে চেন না। ইংরেজটির দিকে বলল, আমি আপনাকে আগেই বলেছি। ওকে দেখেই বুঝতে পেরেছি, ও বাস্‌ক্, ওদের ভাষা কী অদ্ভুত, এখনই শুনতে পাবেন। ওর ধরনধারণ ঠিক জন্তুর মতো নয় কি? দেখে মনে হয়, একটা বেড়াল হেঁসেলে ঢুকে ধরা পড়েছে।

আমি বাস্‌কে বললাম, আর তুই? তোকে দেখে মনে হয় তুই একটা বেহায়া বজ্জাত। ইচ্ছে হচ্ছে, তোর নাগরের সামনেই তোর মুখ ছিঁড়ে দিই।

ও বলল, ওরে আমার নাগর রে! তুই একা একাই সব বুঝে ফেলেছিস? এই পাঁঠাটাকে তোর হিংসে হচ্ছে। রু দ্য কঁদিলোর সন্ধ্যার আগে তুই যা ক্যাবলা ছিলি, তারচেয়েও তোর ক্যাবলামি বেড়েছে দেখছি। তোর ঘটে কি ছিটেফোঁটাও বুদ্ধি নেই? তুই কি দেখছিস না এখন আমি মিশরের ব্যাপার ঘটাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছিস না ভানুমতীর খেল দেখাচ্ছি?

আমি বললাম, তুই যদি আবার এভাবে মিশরের ব্যাপার ঘটাস, তবে আমিও এমন ব্যবস্থা করব, যাতে তুই আর তোর খেল শুরু করতে না পারিস।

এঃ, রোয়াব দেখ না! তুই আমাকে চালাবার কে রে? তুই কি আমার ভাতার? কানাটার তো কোনো আপত্তি নেই। এখানে তুই এমন কী দেখছিস? তুই আমার

একমাত্র মিনশোরো[৫৮]। এতেই তুই খুশি নোস্ কেন?

—লোকটা কী বলছে?—ইংরেজ জানতে চাইল।

—ওর তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খেতে চায়। এই অনুবাদ করে কারমেন হেসে সোফায় লুটিয়ে পড়ল।

মঁসিও, এই মেয়েটা যখন হাসত, তখন ওর সঙ্গে আর যুক্তিতর্ক চলত না। বিশ্বসংসার তখন ওর সঙ্গে হাসত। এই ভারিক্কি ইংরেজও হাসতে লাগল। লোকটা যেমন নির্বোধ। সে হাঁক দিয়ে আমার জন্য জল আনতে বলল। জল খাওয়ার সময় কারমেন বলল, —ওর আংটিটা দেখছিস? চাস তো ওটা তোকে দিতে পারি।

আমি জবাব দিলাম— তোর মি-লর্ডকে পাহাড়ে টেনে নিয়ে দুজনে মাকিলা হাতে লড়তে পারলে আমি হাতের একটা আঙুল দিতে পারি।

মাকিলা? লোকটা কী বলছে? — ইংরেজ প্রশ্ন করল।

কারমেন কেবলই হাসছিল। ও বলল, — মাকিলা মানে কমলালেবু। মজার নাম নয়? ও আপনাকে লেবু খাওয়াতে চাইছে।

— বটে! আচ্ছা, কাল আবার লেবু নিয়ে এস।

যখন আমরা কথাবার্তা বলছিলাম, একটি লোক ঘরে ঢুকে বলল, ডিনার তৈরি। ইংরেজ উঠে দাঁড়াল। আমাকে এক পিয়াস্ত্র দিয়ে কারমেনকে বাহু বাড়িয়ে দিলে। যেন কারমেন একা হেঁটে যেতে পারবে না। ও আবার বলল, —যাদুমণি, আজ তোমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করতে পারছি না। কিন্তু কাল যখন প্যারেডের ড্রাম বাজবে, লেবু নিয়ে এখানে চলে এস। রু্য দ্য কাঁদিলোজর ঘরের চেয়েও সাজানো ঘর পাবে। বুঝতে পারবে আমি তোমারই চিরদিনের কারমেনচিতা। পরে আমরা মিশরের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব।

আমি কোনো জবাব দিলাম না। যখন রাস্তায় নেমে এসেছি, ইংরেজ হেঁকে বলল,— কাল মাকিলা নিয়ে এস। কারমেনের উচ্ছ্বসিত হাসি শুনতে পেলাম।

যখন বেরিয়ে এলাম, তখনও জানি না কী করব। রাত্তিরে একটুও ঘুম এল না। সকালবেলা এই অবিশ্বাসিনীর ওপর এমনই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম যে, স্থির করলাম ওর সঙ্গে দেখা না করেই জিব্রাল্টার ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু ড্রামের প্রথম গুড়গুড় আওয়াজ হতেই আমার সব সংকল্প ভেসে গেল। লেবুর ঝুড়ি নিয়ে কারমেনের ওখানে ছুটলাম। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম— আধখোলা খড়খড়ির মধ্য দিয়ে কারমেনের বড় কালো চোখ আমাকে দেখছে। পাউডার-মাখা পরিচারকটি আমাকে তৎক্ষণাৎ ভেতরে নিয়ে গেল। কারমেন একটা কাজে ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিল।

৫৮। প্রেমিক।

শুধু আমরা দুজন রইলাম। কারমেন আবার সেই কুমীরের হাসিতে ফেটে পড়ল। লাফিয়ে উঠল আমার কাঁধে। ওর এমন মোহিনীরূপ আগে কখনও দেখিনি। সুরভিত বধূর সাজে সেজেছে কারমেন। চারদিকে সিল্কেমোড়া আসবাব। জরির কাজ করা পর্দা। এর মধ্যে আমি যেন একটা ডাকাত ঢুকেছি। আসলে আমি তো ডাকাতই।

কারমেন বলল, মিনশোরো, আমার কী ইচ্ছে হচ্ছে জান ? ইচ্ছে হচ্ছে, এখানকার সব কিছু ভেঙেচুরে, ঘরদোরে আগুন ধরিয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাই। তারপর কি আদর ! কি হাসি ! নাচল কারমেন। ছিঁড়ে ফেলল গায়ের জামা। নেচেকুঁদে ভেংচিকেটে এমন দুষ্টুমি করল যে, হনুমানও ওর কাছে হার মানবে। শেষে স্থির হয়ে আমাকে বলল, শোন, আমি মিশরের ব্যাপারের কথা বলছি। আমি চাইছি, ও আমাকে নিয়ে রঁদা যাক। সেখানে আমার এক সন্ন্যাসিনী বোন আছে (আবার অট্টহাসি) আমরা একটা জায়গা হয়ে যাব। জায়গাটার নাম অগেই তোমাকে বলে দেব। সেখানে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝেড়েপুঁছে সব নিয়ে নিও। ওকে একেবারে সাবাড় করে দেওয়াই ভাল। কথা বলতে বলতে ওর মুখে শয়তানী হাসি ঝিমিয়ে উঠল। এই হাসি কখনো কখনো ওর মুখে দেখেছি। এই হাসি দেখলে অন্যের মুখের হাসি শুকিয়ে যেত। ও বলতে লাগল, কিন্তু কী করতে হবে বুঝতে পেরেছ? দেখ, কানাটা যেন এগিয়ে থাকে। তুমি একটু পিছিয়ে থেকো। গলদাচিংড়িটা সাহসী ও চতুর। ওর ভাল পিস্তল রয়েছে ....বুঝতে পারছ? কারমেন আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আমি শিউরে উঠলাম। বললাম, —না। আমি গার্সিয়াকে ঘৃণা করি কিন্তু ও আমার সঙ্গী। একদিন হয়তো ওকে আমি তোমার কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেব ; কিন্তু বোঝাপড়াটা আমাদের দেশের নিয়মমাফিক হবে। দৈবগতিকে আমি বেদে। অনেক বিষয়ে আমি দিলখোলা না ন্যাভাড়িই থেকে যাব। আমাদের দেশের প্রবাদই রয়েছে।

উত্তরে কারমেন বলল, —একেবারে হাঁদারাম তুই! আসল পায়লো[৫৯]। সেই বামনটার মত, যে দূরে থুতু ফেলে ভেবেছিল বড় হয়েছে[৬০]। তুই আমাকে ভালবাসিস না। তুই দূর হয়ে যা।

ও আমাকে চলে যেতে বলল। যেতে পারলাম না। কথা দিলাম। আমাদের সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাব। ইংরেজটার জন্য ওঁৎ পেতে থাকব। কারমেনও প্রতিশ্রুতি দিল, জিব্রাল্টার থেকে রঁদার যাত্রার সময় পর্যন্ত ও অসুস্থতার ভান করে থাকবে। আরও দুদিন জিব্রাল্টার কাটালাম। সাহস বটে কারমেনের। ছদ্মবেশে আমার সরাইয়ে পর্যন্ত এসেছিল।

৫৯। পরদেশী।
৬০। বেদে প্রবাদ—অবত্রসরজলে দা অর নারসিশিছলে, সিনসিজমার লাশিং গেল।

আমি রওনা হয়ে গেলাম। আমারও একটা মতলব ছিল। কোন্ পথে এবং কখন কারমেন ও ইংরেজ যাবে, জেনে আমাদের আড্ডায় ফিরে গেলাম। দঁকাইর ও গার্সিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বনে পাইনগাছের ফল জড়ো করে চমৎকার আগুন জ্বালিয়ে আমরা রাত কাটালাম। আমি গার্সিয়াকে তাস খেলার কথা বললাম। ও রাজি হল। দ্বিতীয় বাজিখেলার সময় গার্সিয়াকে বললাম, ও খেলায় চুরি করছে। গার্সিয়া হাসতে লাগল। আমি তাসগুলো ওর মুখে ছুড়ে মারলাম। ও বন্দুক নিয়ে রুখে দাঁড়াতে চাইল। আমি বন্দুকটা পা দিয়ে চেপে ধরে বললাম. তুই নাকি মালাগার সেরা মরদের মতো ছুরি চালাতে জানিস্। আমার সঙ্গে একবার লড়ে দেখতে চাস? দঁকাইর আমাদের ছাড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে আমি গার্সিয়াকে দু-তিনটে ঘুসি মেরে ফেলেছি। রাগে গার্সিয়া সাহসী হয়ে উঠেছে। সে ছুরি বার করল। আমিও আমারটা বার করলাম। আমরা দুজনেই দঁকাইরকে সরে দাঁড়াতে বললাম। ও দেখবে—কেউ যেন বেআইনি মার না মারে। দঁকাইর যখন দেখল আমাদের থামাবার কোনো উপায় নেই, তখন সে সরে দাঁড়াল। গার্সিয়া ইতিমধ্যেই ইঁদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে, পরের মুহূর্তে বেড়ালের মত দুভাঁজ হয়ে তৈরি হয়েছে। বাঁ হাতে মার ঠেকাবার জন্য টুপিটি নিয়েছে, ডান হাতে ছুরিটা এগিয়ে ধরেছে। এই হচ্ছে আন্দালুশীয় রক্ষাপদ্ধতি। আমি ন্যাভাড়িদের মত ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। বাঁ হাত উঁচুতে তুলে ধরলাম, বাঁ পা এগিয়ে দিলাম। আর ছুরিটা ডান উরু বরাবর ধরে রাখলাম। আমার দেহে তখন অসুরের বল। গার্সিয়া তীরের মতো আমার দিকে ছুটে এল। আমি বাঁ পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে গেলাম। ওর সামনে কিছু রইল না। কিন্তু আমি টুঁটির নাগাল পেলাম। আমার ছুরিটা এমনভাবে বসে গেল যে আমার হাত এসে ওর চিবুকে ঠেকল। ছুরিটা এত জোরে টেনে বার করলাম যে ফলাটা ভেঙে গেল। সব শেষ। এক হাত উঁচু হয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোল, ভেতরের ছুরির ফলাটা ছিটকে বেরিয়ে এল। একখণ্ড কাঠের মতো মুখ থুবড়ে পড়ল গার্সিয়া। কী করলে তুমি!— দঁকাইর চিৎকার করে উঠল।

আমি বললাম, আমরা দুজন একসঙ্গে বাঁচতে পারতাম না। আমি কারমেনকে ভালবাসি। আমি একা ওকে নিয়ে বাঁচতে চাই। তাছাড়া গার্সিয়া একটা বদমাস। বেচারা রমঁদাদোকে ও কী করেছিল—আমি ভুলিনি। আমরা দুজন মাত্র রইলাম। আমরা খারাপ লোক নই। শোন, জীবনে-মরণে তুমি আমার বন্ধু হবে কি? পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ দঁকাইর হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, জাহান্নামে যাক তোমার পীরিতের কচলা-কচলি। গার্সিয়ার কাছে কারমেনকে চাইলেই পারতে। সে কানাকড়ির দামে কারমেনকে বেচে দিত। এখন আমরা দুজন। কালকে কী উপায় হবে?

উত্তরে আমি বললাম, আমাকে একা সব কিছু করতে দাও। আমি এখন তামাম

দুনিয়াকে পরোয়া করি না। গার্সিয়াকে কবর দিয়ে দুশ গজ দূরে আমরা তাঁবু খাটালাম। পরদিন কারমেন ও ইংরেজকে ভৃত্য ও খচ্চর চালক নিয়ে যেতে দেখলাম। দঁকাইরকে বললাম, আমি ইংরেজটার ভার নিলাম। বাকিগুলো নিরস্ত্র। তুমি ওদের ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা কর।

বুকের পাটা ছিল বটে ইংরেজের। কারমেন ওর হাতে ধাক্কা না দিলে ও আমাকে মেরে ফেলত। এককথায় বলতে গেলে সেদিন কারমেনকে নতুন করে জয় করলাম। প্রথমেই কারমেনকে জানালাম, —ও বিধবা হয়েছে। যা ঘটেছে সব শুনে কারমেন বলল, —চিরকাল হাঁদারাম তুই। গার্সিয়া তোকে মারল না কেন? তোর ন্যাভাড়ি রক্ষাপদ্ধতি তো নিছক বোকামি। তোর চেয়ে অনেক চতুরকে গার্সিয়া জাহান্নামে পাঠিয়েছে। আসলে, ওর সময় হয়েছিল। তোরও সময় আসবে।

তোরও সময় আসবে যদি তুই আমার সত্যিকারের রমি না হোস্, —আমি উত্তর দিলাম।

—সত্যি, কফির তলানিতে আমি অনেকবার দেখেছি আমরা একসঙ্গে যাব। যাকগে, বীজ বুনলে ফল ফলবেই। এই বলে কারমেন কাস্তাইনেত বাজাতে লাগল। বরাবর দেখেছি কোনো নাছোড়বান্দা ভাবনা তাড়াতে কারমেন কাস্তাইনেত বাজাত।

নিজের কথা বলতে সব ভুলে যাই। এত সব বিবরণে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার কথাও প্রায় ফুরোল। এই জীবন বেশ কিছুদিন চলল। দঁকাইর ও আমি পুরনো বন্ধুদের চেয়ে সাহসী কয়েকজন সঙ্গী জুটিয়ে নিলাম। চোরাইচালান করতে লাগলাম। আপনার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই। মাঝে মাঝে রাজপথে ডাকাতিও করেছি। অবশ্য যখন কোনো উপায়ন্তর থাকত না; একেবারে নিরুপায় হয়েই তা করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা পথিকদের নির্যাতন করিনি। টাকা-পয়সা নিয়েই আমরা ক্ষান্ত হতাম।

কয়েকমাস কারমেনকে নিয়ে সুখে কাটালাম। কারমেন আগে থাকতে দাঁও মারবার সুযোগ-সন্ধান দিয়ে আমাদের অভিযানের কাজে লাগতে লাগল। মালাগা, কর্দোভা বা গ্রেনাডা যেখানেই ও থাক না কেন, আমার এককথায় সব ছেড়ে কোনো নির্জন সরাইয়ে বা তাঁবুতে চলে আসত। একবার মাত্র মালাগায় ও আমার অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। সেখানে এক ধনী ব্যবসায়ীকে বেছে নিয়েছিল। হয়তো আবার জিব্রাল্টারের ছিনালি শুরু করার ইচ্ছা ছিল। ব্যাপারটা জানতে পেরেই আমি বেরিয়ে পড়লাম। দঁকাইর শত চেষ্টা করেও আমাকে ঠেকাতে পারল না। দিনের বেলায় মালাগা ঢুকলাম। কারমেনকে খুঁজে বার করে তৎক্ষণাৎ ওকে নিয়ে চলে এলাম। আমাদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হল।

কারমেন বলল, যেদিন থেকে তুমি আমার সত্যিকারের বস হয়েছে, সেদিন

থেকে আমি তোমাকে আর আগের মতো ভালবাসতে পারছি না। তুমি যখন আমার মিনশরো ছিলে, তখন তোমাকে আমি অনেক ভালবাসতাম। আমি এভাবে অত্যাচার সইতে পারব না। তাছাড়া হুকুম মেনে চলা আমার ধাতে নেই। আমি মুক্তি চাই। খুশিমতো বাঁচতে চাই। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমাকে সহ্যের সীমায় ঠেলে দিও না। বেশি বিরক্ত করো না আমাকে। তাহলে তুমি কানাকে যা করেছ, তোমাকেও তাই করার জন্য লোক খুঁজে বার করব আমি।

দঁকাইর মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিল। কিন্তু আমরা পরস্পরকে এমন সব কথা বলছিলাম, যা বুকে বিঁধে রইল। আমরা আর আগের মতো হতে পারলাম না। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের দুভার্গ্য ঘনিয়ে এল। সৈন্যরা আমাদের হঠাৎ আক্রমণ করল। দঁকাইর ও আরও দুজন সঙ্গী নিহত হল। বন্দী হল দুজন। আমি সাঙঘাতিক আহত হলাম। আমার বিশ্বস্ত ঘোড়াটা না থাকলে সৈন্যদের হাতে পড়তাম। অবশিষ্ট একমাত্র সঙ্গীকে নিয়ে ক্লান্তিতে অবসন্ন আমার গুলিবিদ্ধ শরীরটাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে এলাম। গুলি-খাওয়া শশক যেমন কাঁটাঝোপে মরতে আসে, মনে হল আমিও তেমনি মরতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গী আমাকে একটা পরিচিত গুহায় নিয়ে এল। তারপর সে কারমেনের খোঁজে গেল। কারমেন গ্রেনাডায় ছিল। তৎক্ষণাৎ ছুটে এল। পনের দিন এক মুহূর্তের জন্যও আমার পাশ ছেড়ে যায়নি। একবার চোখ বোজেনি। এমন সযত্ন নিপুণ হাতে ও আমার সেবা করল যা কোনো নারী কখনও তার প্রিয়তমের জন্যেও হয়তো করেনি। যখন আমার উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তি হল, ও অতি সংগোপনে আমাকে গ্রেনাডায় নিয়ে এল।

সর্বত্র বেদেদের নিশ্চিত আশ্রয় রয়েছে। দু সপ্তাহেরও বেশি গ্রেনাডায় কাটালুম। আমার বাসার পর দুটো বাসা। তারপরই পুলিশ সাহেবের বাড়ি। সে আমাকে খুঁজছে। বেশ কয়েকবার জানালার খড়খড়ির পিছন থেকে যেতে দেখেছি। ক্রমে আমি সেরে উঠলাম। রোগশয্যায় অনেক ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করলাম—আমার জীবনধারা পালটে ফেলব। কারমেনকে স্পেন ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বললাম। আমেরিকায় গিয়ে আমরা সৎ ভাবে বাঁচব। কারমেন আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল। বলল, আমরা বাঁধাকপি ফলাতে জন্মাইনি। পরদেশীদের আয়ে বাঁচাই আমাদের ধর্ম। জিব্রাল্টারের নাথানবেন জোসেফের সংগে একটা ব্যবস্থা হয়েছে। সুতি কাপড়ের মাল রয়েছে। ওটা চালান করতে তোমাকেই দরকার। তুমি কথা ঠিক না রাখলে আমাদের জিব্রাল্টরের সাঙ্গাতরা কী বলবে। এভাবে আবার আমাকে টেনে নামাতে দিলাম। আবার দুষ্কর্ম শুরু করলাম।

গ্রেনাডায় যখন লুকিয়ে ছিলাম, তখন কারমেন ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যেত। ফিরে এসে লুকাস নামে এক সুচতুর পিকাদরের কথা প্রায়ই বলত। কারমেন ওর

ঘোড়ার নাম, এমনকি ওর এমব্রয়ডারি করা ভেস্টের দাম পর্যন্ত ও জানত। আমি ওর কথায় কান দিইনি। কয়েকদিন পরে আমার অবশিষ্ট একমাত্র সঙ্গী আমাকে বলল, সে জাকাতিনের এক ব্যবসায়ীর বাসায় লুকাসের সঙ্গে কারমেনকে দেখেছে। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কারমেনকে প্রশ্ন করলাম কীভাবে ও কেন লুকাসের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে।

কারমেন বলল, ও একটা লোক বটে। ওর সঙ্গে কাজ-কারবার চলতে পারে। ষাঁড়ের লড়াইয়ে মাঠে ও বারশ রিউ[৬১] আয় করেছে। দুটোর একটা কাজ করতে হবে। হয় ওর টাকাটা হাতাতে হবে, নয় তো ভাল ঘোড়সওয়ার এই সাহসী জওয়ানকে আমাদের দলে নিতে হবে। অমুক অমুক লোক মারা গেছে—তাদের স্থান পূর্ণ করতে হবে। তোমার সঙ্গে ওকে নিয়ে নাও!

আমি উত্তর দিলাম,—আমি ওকে বা ওর টাকা এই দুটোর কোনোটাই চাই না। তোমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে মানা করে দিচ্ছি। সাবধান!

কারমেন জবাব দিল, যখন কেউ অমাকে কোনো কাজ করতে মানা করে, তা করতে আমার একটুও দেরি হয় না।

সৌভাগ্যবশত পিকাদর মালাগায় চলে গেল। আমি ইহুদির সুতির মাল চালনোর কাজে ব্যস্ত রইলাম। এই অভিযানে আমাকে অনেক কিছু করতে হয়েছিল। কারমেনকেও। লুকাসের কথা ভুলে গেলাম। হয়তো সেসময় কারমেনও ওকে ভুলে ছিল। এই সময়ই মন্তিল্লার কাছে পরে কর্দোভায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমাদের শেষ সাক্ষাৎকারের কথা আর আপনাকে বলার দরকার নেই। সে বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন। কারমেনই আপনার ঘড়িটা চুরি করেছিল। ও আপনার টাকাকড়ি—বিশেষ করে আপনার আঙুলের আংটিটি নিতে চেয়েছিল। ও বলেছিল, ওটা নাকি যাদু আংটি। ওর বিশেষ দরকার। আমাদের ভীষণ ঝগড়া হল। আমি ওর গায়ে হাত দিলাম। ফ্যাকাশে হয়ে গেল কারমেন। কাঁদল। এই প্রথম ওকে কাঁদতে দেখলাম। তার ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হল আমার ওপর। আমি ক্ষমা চাইলাম, কিন্তু সারাটা দিন কারমেন মুখ ভার করে রইল। আমি যখন মন্তিল্লা রওনা হলাম ও আমাকে চুমু খেতে চাইল না। আমার বুকে ভীষণ বোঝা চেপে রইল। তিনদিন পর যখন ও কাছে এল, দেখলাম ওর হাসিমুখ। ফিঙের মতো ও আনন্দ পেল। সব ভুলে কাছে এল। প্রথম প্রেমমুগ্ধের মতো আমরা দুটো দিন কাটালাম, বিদায়ের প্রাক্কালে কারমেন বলল, কর্দোভায় উৎসব দেখতে যাচ্ছি। পয়সাওলা মক্কেল গেলে আমি জানতে পারব। তোমাকে খবর দেব।

৬১। স্পেনের মুদ্রা।

ওকে যেতে দিলাম। একা বসে উৎসবের কথা ও কারমেনের মেজাজের কথা ভাবতে লাগলাম। এরই মধ্যে নিশ্চয় ও আমার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। কেননা ওই প্রথম ফিরে এসেছে। একটা চাষী আমাকে বলল, কর্দোভায় ষাঁড়ের লড়াই হচ্ছে। আমার রক্ত টগবগ করে উঠল। উন্মত্তের মত বেরিয়ে পড়লাম। চলে গেলাম সেখানে। সবাই লুকাসকে দেখিয়ে দিল। বেড়ার ধার ঘেঁসে একটা বেঞ্চিতে কারমেনকে দেখলাম। ওকে একমিনিট দেখেই প্রকৃত সত্য বুঝতে পারলাম। ঠিক যেমন ভেবেছিলাম—লুকাস প্রথমদিকে ষাঁড়টার সঙ্গে হেসে খেলে লড়ছিল। ষাঁড়টার কপাল থেকে ফিতার ফুলটা[৬২] তুলে নিয়ে কারমেনকে উপহার দিল। কারমেন অমনি ফুলটা খোঁপায় পরল। ষাঁড়টা যেন আমার হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য লুকাসকে আক্রমণ করল। ঘোড়াশুদ্ধ উলটে ফেলে দিল ওকে। লুকাস নিচে পড়ে, ঘোড়াটা ওর বুকের ওপর, আর দুটোর ওপর ষাঁড়টা। কারমেনের দিকে তাকালাম। কারমেন আর ওর জায়গায় নেই। আমি যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে তখন বেরোনো অসম্ভব। ষাঁড়ের লড়াই শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। তারপর আমি বাসায় ফিরে এলাম। বাসাটা আপনি চেনেন। সারা সন্ধ্যা ও অনেক রাত পর্যন্ত মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম। শেষ রাত্রিতে দুটো নাগাদ কারমেন এল। বিস্মিত হল আমাকে দেখে। ওকে বললাম আমার সঙ্গে এস।

আচ্ছা চল, ও জবাব দিল।

ঘোড়াটা নিয়ে এলাম। কারমেনকে ঘোড়ায় বসিয়ে নিলাম। একটা কথা না বলে বাকি রাতটুকু পথ চললাম, দিনের বেলায় এক নির্জন সরাইয়ে এসে থামলাম। কাছেই এক সাধুর আশ্রম। কারমেনকে বললাম, শোন, আমি সব ভুলে যাব। তোমাকে কিছু বলব না। শুধু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমার সঙ্গে আমেরিকা যাবে। সেখানে শান্ত হয়ে থাকবে। না, ও থমথমে গলায় উত্তর দিল। আমি আমেরিকা যেতে চাই না। এখানেই বেশ আছি। আমি বললাম, তার কারণ তুমি লুকাসের কাছে রয়েছ। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ—সেরে উঠলেও সে পুরনো কথা মনে রাখবে না। তাছাড়া, ওকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন ? তোমার প্রেমিকদের খুন করে আমি হয়রান হয়ে গেছি। এবার আমি তোমাকে খুন করব।

ওর বন্য চোখের স্থিরদৃষ্টিতে ও আমাকে বিদ্ধ করল। বলল, আমি বরাবর জানি—তুমি আমাকে খুন করবে। প্রথম যখন তোমাকে দেখি, ঠিক তখন আমার দোরগোড়ায় একজন পাদ্রীকে দেখেছিলাম। কাল রাত্তিরে কর্দোভা ছেড়ে চলে আসার

৬২। ফিতার ফুলের রঙ দেখে কোথা থেকে ষাঁড়টাকে আনা হয়েছে, বোঝা যেত। হুক দিয়ে ষাঁড়ের চামড়ার সঙ্গে ফিতার ফুলটা আটকে দেওয়া হতো। ষাঁড়টাকে না মেরে ওই ফুলটা ষাঁড়ের কপাল থেকে তুলে নিয়ে কোনো নারীকে উপহার দেওয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা বলে স্বীকৃত ছিল।

পথে তুমি কি কিছুই দেখনি? একটা খরগোশ তোমার ঘোড়ার পায়ের তলা দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গেল। এই অদৃষ্টের লিখন।

—কারমেনচিতা! আর কি তুমি আমাকে ভালবাসবে না? ও কোনো জবাব দিল না, পা দুটো আড়াআড়িভাবে রেখে একটা মাদুরে বসল। মাটিতে আঁক কাটতে লাগল আঙুল দিয়ে।

কারমেনকে বললাম, কারমেন! আমরা আমাদের জীবন বদলে ফেলব। এমন কোথাও চলে যাব, যেখানে কোনোদিন আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। তুমি জান কাছেই একটা ওকগাছের নিচে একশ অজ্জা[৬৩] লুকানো আছে। ইহুদি বেন জোসেফের কাছেও গচ্ছিত ধন আছে।

ও হেসে বলল, প্রথমে আমি; পরে তুমি। আমি জানতাম এই ঘটবে। আবার বললাম, ভেবে দেখ। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। আমি সাহস হারিয়ে ফেলছি। তুমি তোমার পথ বেছে নাও। আমি আমারটা বেছে নেব।

ওকে রেখে আশ্রমের দিকে এগিয়ে গেলাম। সাধুটি তখন প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। একবার ইচ্ছা হয়েছিল আমিও প্রার্থনা করি, কিন্তু পারলাম না। সাধুটি যখন প্রার্থনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন, আমি কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম, বাবা! দারুণ বিপদগ্রস্ত কোনো মানুষের জন্য কি আপনি প্রার্থনা করবেন?

—প্রত্যেক ক্লিষ্ট মানুষের জন্য আমি প্রার্থনা করি, সাধুটি জবাব দিলেন। সৃষ্টিকর্তার কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় হয়েছে—এমন কোনো আত্মার জন্য আপনি মাস অনুষ্ঠান করবেন কি?

আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আমার অস্বাভাবিক উদ্‌ভ্রান্তভাব লক্ষ্য করে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। বললেন, সম্ভবত আমি আপনাকে দেখে থাকব।

বেঞ্চিতে একটি পিয়াস্ত্র রেখে বললাম, কখন আপনি মাস অনুষ্ঠান করবেন?

—আধঘণ্টার মধ্যে। এই সরাইওয়ালার মেয়ে সব ব্যবস্থা করতে আসবে। সত্যি করে বল, যুবক। তোমার মনে কি এমন কিছু আছে যা তোমার বিবেককে পীড়া দিচ্ছে? একজন খ্রিস্টানের উপদেশ শুনবে কি?

কান্নায় ভেঙে পড়ার অবস্থা হয়েছিল আমার। আমি আবার ফিরে আসব, —এই বলে পালিয়ে এলাম। গির্জার ঘণ্টা না-শোনা পর্যন্ত ঘাসের ওপর শুয়ে রইলাম। মাস সাঙ্গ হওয়ার পর সরাইয়ে ফিরে এলাম।

৬৩। স্পেনীয় মুদ্রা।

আশা করেছিলাম কারমেন পালিয়ে যাবে। ও আমার ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সরাইয়ে ফিরে দেখলাম, ও যায়নি। আমার ভয়ে পালিয়েছে,—এই চিন্তা ওর পক্ষে অসহ্য। আমি চলে যাওয়ার পর ও ওর পোশাকের কোণের সেলাই খুলে সীসা টেনে বার করেছে। টেবিলের সামনে বসে একটা জলভর্তি মাটির পাত্রের তলায় যে সীসা আগে ফেলেছে এবং এইমাত্র যে সীসা ফেলল, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। জাদুতে এমন মগ্ন ছিল, আমি যে ফিরে এসেছি তাও বুঝতে পারেনি। কখনও একটুকরো সীসা নিয়ে চারদিকে ঘোরাচ্ছিল। ওর মুখ বিষাদে মাখা। মাঝেমাঝে ওদের কোনো একটা যাদুময় গান গেয়ে ডন পেড্রোর প্রণয়িনী মারি পাদিল্লার আহ্বান করছিল। প্রবাদ আছে, মারি পাদিল্লা[৬৪] হচ্ছেন বারি ক্রালিসা বা বেদেদের রানী।

ওকে বললাম, কারমেন আমার সঙ্গে আসবে কি? ও উঠে দাঁড়াল, ছুড়ে ফেলে দিল পাত্রটা। মাথায় ওড়না টেনে দিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। আমার ঘোড়া আনা হলে ও আমার পিছনে ঘোড়ায় উঠে বসল। আমরা যাত্রা করলাম।

কিছু পথ গিয়ে বললাম, কারমেন, এভাবে তুমি আমার সঙ্গে চলবে, নয় কি?

হ্যাঁ, আমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমাকে অনুসরণ করব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর আমি বাঁচতে পারব না।

একটা নির্জন গিরিসংকটে পৌঁছে ঘোড়া থামালাম।

এখানেই? —বলেই কারমেন এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ওড়না খসিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল পায়ের কাছে। কোমরে একটা হাত রেখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর স্থির দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করল। বলল, বেশ বুঝতে পারছি তুমি আমাকে খুন করবে। কপালে তাই লেখা আছে। কিন্তু তুমি আমাকে হার মানাতে পারবে না।

ওকে বলালাম, তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। কথা শোন। গোটা অতীত মুছে ফেলব। তুমি জান তোমার জন্য আমি সব হারিয়েছি। তোমার জন্যই আজ আমি ডাকাত, খুনী। কারমেন! আমার কারমেন! তোমাকে বাঁচতে দাও, আমাকেও বাঁচতে দাও।

ও উত্তর দিল, জোসে, তুমি অসম্ভবকে চাইছ। আমি আর তোমাকে ভালবাসি না। তুমি এখনও আমাকে ভালবাস। তাই তুমি আমাকে খুন করতে চাইছ। তোমাকে এখনও মিথ্যা বলে ভোলাতে পারি, কিন্তু তোমাকে আর দুঃখ দিতে চাই না। আমাদের দুজনের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে; রম হিসাবে রমিকে মেরে ফেলবার অধিকার

৬৪। কিংবদন্তী আছে, মারি পাদিল্লা রাজা ডন পেড্রোকে সম্মোহিত করেছিলেন। ইনি রানী ব্লাঁস দ্য বুরবঁকে একটি সোনার মেখলা উপহার দেন। রাজার সম্মোহিত দৃষ্টিতে এই মেখলা একটি জীবন্ত সাপ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তাই রাজার মন এই ভাগ্যহীনা রাজকুমারীর প্রতি বিরূপ হয়েছিল।

তোমার আছে। কিন্তু কারমেন চিরকাল মুক্ত থাকবে। বেদে হয়ে জন্মেছে, বেদে হয়েই মরবে।

প্রশ্ন করলাম, তুমি তাহলে লুকাসকে ভালবাস?

—হ্যা, ওকে তোমার মতই ক্ষণিকের জন্য ভালবেসে ছিলাম। হয়তো তোমার মতোও নয়। এখন আমি আর তোমাকে একটুও ভালবাসি না। তোমাকে ভালবেসেছিলাম বলে নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছে।

আমি ওর পায়ে আছড়ে পড়লাম। ওর হাতে ধরলাম। চোখের জলে ওর দুহাত ভিজিয়ে দিলাম। একসঙ্গে কাটিয়েছি—এমন সব সুখের মুহূর্তের কথা মনে করিয়ে দিলাম। ওকে খুশি করতে চিরজীবন ডাকাত হয়ে থাকতে রাজি হলাম। ও যা চায় সবকিছু করতে রাজি হলাম—সব, সব। শুধু ও আমাকে আবার ভালবাসবে।

ও শুধু বলল, তোমাকে আবার ভালবাসব? অসম্ভব। তোমার সঙ্গে আর আমি বাঁচতে পারব না। রাগে আত্মহারা হয়ে ছুরি বার করলাম। তখনও ভেবেছিলাম ভয় পেয়ে ও আমার করুণা ভিক্ষা করবে। কিন্তু কারমেন দানবী।

চিৎকার করে উঠলাম, শেষবারের মত বলছি—আমার সঙ্গে থাকবে কি?

মাটিতে পা ঠুকে কারমেন বলল, না! না! না! আমার দেওয়া আংটিটা আঙুল থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দিল কাঁটাঝোপে।

দুবার ছুরি দিয়ে ওকে আঘাত করলাম। ছুরিটা কানা গার্সিয়ার। আমার ছুরিটা ভেঙে যাওয়ার পর আমি ওটা নিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার আঘাতের পর ও পড়ে গেল। ওর দীর্ঘকায় চোখের স্থির দৃষ্টি এখনও আমার চোখে ভাসছে। একটু পরে ওর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল, চোখের পাতা বুজে এল। বিমূঢ় হয়ে ওর মৃতদেহের পাশে একঘণ্টা বসে রইলাম। মনে পড়ল—কারমেন প্রায়ই বলত, কোনো বনে ওর মৃতদেহ কবর দিলে ও খুশি হবে। ছুরি দিয়ে গর্ত খুঁড়ে কারমেনকে সেখানে রাখলাম। বহুক্ষণ খুঁজে ওর আংটিটা পেলাম। গর্তের মধ্যে ওর পাশে আংটিটা আর একটা ছোট ক্রুশ রেখেছিলাম। হয়তো ভুল আমারই। ঘোড়ায় উঠে বসলাম। কর্দোভা অবধি ঘোড়া হাঁকিয়ে প্রথম যে রক্ষীশিবির পেলাম, সেখানে নিজের পরিচয় দিলাম। বললাম, আমি কারমেনকে হত্যা করেছি কিন্তু ওর মৃতদেহ কোথায় আছে আমি বলিনি। সাধুটি ধর্মাত্মা। তিনি ওর জন্য প্রার্থনা করেছেন। ওর আত্মার শান্তির জন্য মাস অনুষ্ঠান করেছেন।

আহা বেচারা! আসল অপরাধী বেদেরা। ওরাই কারমেনকে ওভাবে গড়ে তুলেছিল।